স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
১ম বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল- মে ২০১২

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল	❑	ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু	❑	ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার	❑	ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	❑	ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল	❑	ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ স্নেহাশিস পাত্র

প্রচ্ছদ ❑ মনোজ দে

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
স্বাস্থ্যের বৃত্ত
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রণ
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

চিঠিপত্র ২০

শরীর
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা: হৃদযন্ত্র ফুসফুস ও মস্তিষ্কের পুনরুজ্জীবন ❑ ডা. সুব্রত গোস্বামী ৩
শিশুর গলায় কিছু আটকে গেলে ❑ শান্তিময় সৎপতি ৬
জ্বর-জ্বালা ❑ ডা. পার্থপ্রতিম পাল ১০
পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম বা পি সি ও এস ❑ ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ১৪
ব্রণ নিয়ে দুর্ভাবনা! ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ১৮

শরীর সমাজ চিকিৎসা
শিশুর খাবার — দু'বছর বয়সের পরে ❑ ডা. অতনু ভদ্র ৯
ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষা বাড়ছে ❑ ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ২১
জীবন যখন শুকায়ে যায় ❑ ডা. সুস্মিতা ঘোষাল ২২
ভ্যাসেকটমি ❑ ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী ২৪
হাত ধোওয়া ❑ শ্রী মানস রঞ্জন মাইতি ২৬

মন
আত্মহত্যা ❑ ডা. সুমিত দাশ ২৮

ডাক্তারের ডেস্ক ৩০

ল্যাবরেটরির অন্তর-মহল
অস্থিমজ্জা পরীক্ষা নিয়ে দু চার কথা ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী ৩৪

স্মরণে
কাদম্বিনী বসু থেকে ডক্টর গাঙ্গুলি ❑ সোমা মুখোপাধ্যায় ৩৬

শরীর ঘিরে রাজনীতি
স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার ❑ ডা. বিনায়ক সেন [অনুবাদ: ডা. ইলা লাহিড়ী ও ডা. জয়ন্ত লাহিড়ী] ৩৮
ফুকুশিমার পার্শ্ববর্তী লাইতেত-এর কাহিনী ❑ প্রদীপ দত্ত ৪০
বিষের কৃষি: নেপথ্যের অন্যকথা ❑ কল্যাণ রুদ্র ৪৩
জিন-বলে রোগ-আরোগ্য ও ছলে-বলে প্রজনন ব্যবসা ❑ ড. তুষার চক্রবর্তী ৪৭

চলচ্চিত্রে ডাক্তার
সপ্তপদীঃ ডাক্তার যখন বাবাসাহেব ❑ অংশুমান ভৌমিক ৫০

কুইজ
অভিষেক দাস ৪২

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও নৈতিকতা

পড়ে গিয়ে তাঁর কোমর ভেঙে গেছে, একেবারে শয্যাশায়ী, মলমূত্র ধারণের ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে, এমনকি মাঝে মধ্যে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। একটি সরকারি হাসপাতালেই তিনি ভর্তি আছেন, তবে হাসপাতালে কোমর ভাঙার চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তাই তাঁকে অন্য একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ডাক্তারবাবুরা ভর্তি নেননি। ফলে তাঁকে ঐ অবস্থাতেই ঘুরতে হল তিন-তিনটি হাসপাতাল। ভর্তি কিন্তু হওয়া গেল না, ফিরে আসতে হল তাঁর মানসিক রোগের হাসপাতালের শয্যাতেই।

এই সেদিন একটি জেলার মানসিক রোগের হাসপাতালে কয়েকদিনের মধ্যে ১৪ জন মানুষ মারা গেলেন। পদাধিকারীরা বললেন এটাই স্বাভাবিক। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন এমন কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলে সেখানে গেলেন এবং সরজমিনে তদন্ত করে দেখলেন যেভাবে সেখানে মানুষদের রাখা হয় তা আদিম এবং এমনকি আমাদের জেলখানাকেও লজ্জা দেবে।

কেবল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবি তা অবশ্য নয়। আমাদের চিন্তায় সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত মানুষের বাঁচার সমস্যার চাইতে কলকাতার বর্ষায় জল জমা বড় সমস্যা। ঝোপড়ি-বস্তিতে যাঁরা থাকেন তাঁদের সমস্যার চাইতে আমাদের সমস্যার গুরুত্ব বেশি। জঙ্গলমহলের মানুষের চাইতে মহানগর-বাসিন্দাদের কথা আগে শোনা দরকার।

'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' কেবল মাত্র প্রযুক্তির উন্নতি দিয়ে স্বাস্থ্যের সমস্যাকে দূর করা যাবে না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে জীবনের অধিকার, নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্রের অধিকার ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। সমতার ধারণা ও সম অধিকারের ধারণা থাকবে না, অথচ কয়েকটা আইন প্রণয়ন করে সমস্ত জনসাধারণের সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হয়ে যাবে— এটি অবাস্তব কল্পনা।

আমাদের আইন-প্রণয়নকারীদের উপর সব দায়িত্ব সঁপে দিয়ে আমরা নাগরিকরা যদি নিশ্চিন্তে ঘুমোই, তবে উন্নতির আশা নেই। আমাদের জন্য মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা শেষবিচারে আমাদের দায়। আমাদেরই দায়।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ঃ হৃদযন্ত্র ফুসফুস ও মস্তিষ্কের পুনরুজ্জীবন

২০০৪ সালে ব্যাঙ্গালোরে ফেডারেশন কাপের ফাইনাল খেলায় মোহনবাগানের গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলেন ডেম্পোর ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। এবং মারা গেলেন। ২০০৩ সালের ২৬ জুন, ফ্রান্সে ফিফা কনফেডারেশন কাপ। কামেরুনের ভিভিয়ান ফো'র হৃদস্পন্দন খেলার মাঠেই আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। মারা যান তিনিও। এই মৃত্যুগুলি সবার চোখের সামনে ঘটেছে, টিভির পর্দায় দেখেছেন লক্ষ-কোটি মানুষ। কিন্তু এরকম কত মৃত্যু যে চোখের আড়ালে ঘটে, ঘটেই চলে, কেউ জানতেই পারেন না, তার লেখাজোখা নেই। কে বলতে পারে আপনার প্রিয়জন একজন সুস্থ মানুষও এরকম বেঘোরে মারা পড়বেন না? এই মৃত্যু মোটেই অবধারিত নয়, এবং সামান্য একটু চেষ্টা করলে মৃত্যুকে হার মানানো যায়— লিখছেন **ডা. সুব্রত গোস্বামী**।

১৯৮০ সাল, ১৬ আগস্ট: দিলীপ পালিত আর বিদেশের মাথা গরম আর খেলার মাঠে ১৬ জন ক্রীড়া প্রেমীর আকস্মিক মৃত্যু মনে পড়ছে কি? পিজি হাসপাতালে এদের নিয়ে যাবার পর দেখা গিয়েছিল, যদি এদের স্থানান্তরিত করার সময় শুধুমাত্র পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে আনা যেত, তাহলে মুখের ভেতর রক্ত ও বমি জমে শ্বাস বন্ধ হয়ে এত মৃত্যু হত না।

২০০৩ সাল, ২৬ জুন: ফ্রান্সে ফিফা কনফেডারেশন কাপে কামেরুনের ভিভিয়ান ফো খেলার মাঠে আচমকাই হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে মারা যান, তিন চার মিনিট পর যখন মাঠ থেকে বার করে ডাক্তাররা বাঁচাবার চেষ্টা করেন, ততক্ষণে সব শেষ।

ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রকে সি পি আর দেওয়ার চিত্র (উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও পদ্ধতি ঠিক নয়)

২০০৩ সালেই কিন্তু এশিয়ান কাপ চাম্পিয়ানশিপে জাকার্তায়, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের দেবজিত ঘোষের হৃদস্পন্দন বন্ধ হলেও টিমের কর্মকর্তা চিকিৎসক শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত ঠিক সময়ের ভেতর কার্ডিয়াক মাসাজ দিয়ে দেবজিতকে বাঁচিয়ে দেন।

২০০৪ সালের ৫ ডিসেম্বর: ব্যাঙ্গালুরুর কান্তিভারা স্টেডিয়ামে সুব্রত পালের সাথে মামুলি ধাক্কায় পড়ে গেলেন ব্রাজিল থেকে খেলতে আসা ডেমপো ক্লাবের জুনিয়র। মাঠে ছিলেন না ডাক্তার কিংবা সঠিক ভাবে কৃত্রিম শ্বাস বা হার্ট মাসাজ করতে জানা কোনো স্টাফ, টিভিতে দেখা গেল নাক বন্ধ না করেই মুখ দিয়ে বাতাস দিচ্ছেন এক ব্যক্তি, কেউ দিশেহারা হয়ে মাথায় জল ঢালছেন। না, বাঁচানো যায়নি আমাদের সবার প্রিয়জন হয়ে যাওয়া জুনিয়রকে!

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? দেবজিতকে বাঁচানো যদি অসম্ভব না হয়, তাহলে ভিভিয়ান ফো বা ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রকেও কি বাঁচানো সম্ভব ছিল? উত্তর এক কথাতেই দেওয়া যায়, হ্যাঁ, এসব ক্ষেত্রে বাঁচানো সম্ভব, শুধু ঠিক ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রয়োগ করতে হবে সি পি আর।

সি পি আর? সে জিনিসটা আবার কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে মানুষের দেহ সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেওয়া দরকার।

প্রকৃতি আমাদের সবাইকে বিস্ময়কর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপহার দিয়েছেন যা কোনো আধুনিক যন্ত্রকে হার মানাতে পারে। মস্তিষ্ক হল সবার চালক। দু'জন ভি আই পি আছেন, এরা হলেন হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস। ফুসফুস প্রতি ১ মিনিটে বারো থেকে ষোলো বার কামারশালার হাপরের মতো বাতাস টেনে নিয়ে, তার থেকে অক্সিজেন সরবরাহ করে নিকটতম প্রতিবেশী হৃদযন্ত্রকে। হৃদযন্ত্র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার পাম্প করে রক্তের মাধ্যমে অবিরাম সেই অক্সিজেনকে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। কিডনি, লিভার, অন্ত্র সমেত প্রায় সকলেই বহু সময় অক্সিজেন না পেলেও কর্মক্ষম থাকে, কিন্তু মস্তিষ্কে তিন মিনিটের বেশি অক্সিজেনের অভাব ঘটলেই তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের মৃত্যু ঘটে।

অনেক সময়, যেমন পথ-দুর্ঘটনায়, খেলার মাঠে বিশেষত ফুটবল, রাগবি, মুষ্ঠিযুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে, জোরালো আঘাতে আচমকা হৃদযন্ত্র থেমে যেতে পারে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে, বা বজ্রপাতেও বন্ধ হতে পারে হৃদযন্ত্রের কাজ। আবার জলে ডোবার পর, শ্বাসনালীতে খাবার, শিশুদের ক্ষেত্রে ছোট জিনিস যেমন পেনসিলের খাপ ইত্যাদি দিয়ে বা যেকোনো অ্যাক্সিডেন্টের পর মুখের ভিতর রক্ত, বমি এসব জমে প্রশ্বাস নেবার পথ অনেক সময় বন্ধ হতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার রাস্তা বন্ধ হলে হৃদযন্ত্রে অক্সিজেন পৌঁছায় না।

তাই প্রাথমিক কারণ ফুসফুস হোক বা হৃদযন্ত্র, এ দুইয়ের কোনো একটির বৈকল্য হলেই অক্সিজেন মেশানো বিশুদ্ধ রক্ত আমাদের শরীরের

কোথাও পৌঁছায় না। তখন অন্যসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ চালিয়ে যেতে পারলেও মোটামুটি তিন মিনিট পরেই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলির অপমৃত্যু ঘটতে থাকে। এরপর কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে সেই মানুষটিকে জীবিত করার সমস্ত চেষ্টা করলে হয়তো তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেও পারেন, কিন্তু বাকি জীবনটা তিনি কার্যত মস্তিষ্কহীন জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন।

তাই এই অমূল্য তিন মিনিট সময়কে বলা হয় জীবন ও মৃত্যুর দূরত্ব। এই তিন মিনিটের ভেতর চিকিৎসক আসবেন এটা আশা করা যায় না। তখন ঐ মানুষটির আশেপাশে থাকা আর পাঁচজন মানুষকেই প্রাণদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়, নতুবা অসহায়ের মতো প্রিয়জনের মৃত্যু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। কি ভাবছেন? প্রাণদাতা হওয়া কি এতই সোজা? আমি বলছি হ্যাঁ, সোজা, আপনি, আপনিই পারেন একটি অবধারিত মৃত্যুকে জীবনে পরিণত করতে। কিভাবে? সেকথাই এবার বলছি।

আপনাকে একটি বেশ সরল পদ্ধতি এখানে আমি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। সেটা শিখে নিন। বিশ্বাস করুন এই পদ্ধতিটি শেখা সাইকেল চালানো শেখার চাইতেও সোজা। মনে রাখুন একবার এ পদ্ধতিটি শিখে গেলে আপনার জীবনে যে কোনও দিন সুযোগ এসে যাবে একজন মানুষকে, হয়তো বা আপনারই কোনও প্রিয়জনকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার। এই পদ্ধতির নাম 'জীবন সহায়ক কৌশল' (Basic Life Support) বা ''হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের পুনরুজ্জীবন'' (Cardio Pulmonary Resuscitation, CPR) বা ''হৃদযন্ত্র ফুসফুস ও মস্তিষ্কের পুনরুজ্জীবন'' (Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation, CPCR)। বড় বড় নাম শুনে ঘাবড়াবেন না, নাম মনে রাখারও দরকার নেই, খালি মনে রাখুন কি করলে মানুষটি বাঁচবেন।

১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিন কোটির বেশি মানুষ এই শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়েছেন, যাঁদের কেউই চিকিৎসা পেশার মধ্যে নেই। সেই দিন বেশি দূরে নেই যেদিন আমাদের দেশেও অন্তত মাধ্যমিক স্কুলে এই অমূল্য শিক্ষাটি চালু হবে।

পদ্ধতিটির বিবরণ

ক) কোনো মানুষ আচমকা জ্ঞান হারালে প্রথমেই তাঁকে একটা শক্ত জায়গাতে (যেমন মেঝেতে) শুইয়ে দিতে হবে। তাঁকে হালকা ভাবে ধাক্কা দিয়ে দেখতে হবে তিনি সাড়া দিচ্ছেন কিনা। (চিত্র ১)

চিত্র ১

সাড়া না পেলে প্রথমেই আরও আশেপাশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহায্য চাইতে হবে। (চিত্র ২)

চিত্র ২

খ) অজ্ঞান হয়ে গেলে অনেক সময় জিভের পেছনের অংশটা দিয়ে শ্বাস-পথ বন্ধ হয়ে থাকে। তাই চিবুকটিকে একটু তুলে, বা গলার পিছন দিকে হাত দিয়ে, মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে দিতে হবে। (চিত্র ৩)

চিত্র ৩

গ) এরপর দেখতে হবে মানুষটি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন কিনা। তাঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে কান দিয়ে তাঁর নাকের ভিতর দিয়ে আসা নিঃশ্বাসের প্রবাহ অনুভব করতে হবে, দেখতে হবে বুক ও পেটের ওঠা-নামা বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ। (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪

ঘ) যদি শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে অথচ সাড়া না দেন, তবে একদিকে পাশ ফিরিয়ে ''নিরাপদ ভঙ্গীতে'' শুইয়ে দিতে হবে। (চিত্র ৫)

চিত্র ৫

ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাস চালু না থাকলে অজ্ঞান মানুষটির মুখ শক্ত কিছু দিয়ে ফাঁক করে, একটি বা দুটি আঙুল ঢুকিয়ে মুখের ভেতর যদি রক্ত, খাবার বা অন্য কিছু থাকে তা বার করে দিতে হবে। (চিত্র ৬)

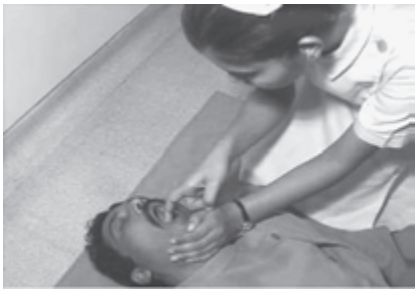

চিত্র ৬

চ) এরপরও যদি শ্বাস-প্রশ্বাস চালু না হয় তবে এক হাত গলার পিছনে এবং অন্য হাত কপালে রেখে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তাঁর নাক বন্ধ করে মুখ হাঁ করিয়ে দিতে হবে। এবার নিজে হাঁ করে তাঁর মুখের ফাঁক সম্পূর্ণ ঢেকে তাঁর মুখের ভেতর বাতাস ফুঁ দিয়ে প্রবাহিত করতে হবে। দেখুন তাঁর মাথা যেন পিছন দিকে হেলানো অবস্থায় থাকে। (চিত্র ৭)

চিত্র ৭

আর ফুঁ দেবার আগে নিজে জোরে শ্বাস নিয়ে নিজের বুকটা যতটা সম্ভব ফুলিয়ে নিন।

এইভাবে প্রতিবারে অন্তত প্রায় ৬০০ মিলিলিটার বাতাস প্রবেশ করানো সম্ভব। প্রতিবার বাতাস প্রবেশ করানোর পর দেখুন রোগীর বুক ও পেট বাতাস ঢুকে ফুলে উঠছে কিনা। তা না হলে বুঝতে হবে বাতাস ফুসফুসে ঢুকছে না, হয়তো আপনার আর রোগীর মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখুন ফুঁ দেওয়া বলছি বটে, আসল ব্যাপারটা হল আপনার শরীর থেকে তাঁর শরীরের ফুসফুসে বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অ্যাম্বু ব্যাগ দিয়েও একাজ করা যায়।

চ) এইভাবে অন্তত দুবার কৃত্রিম প্রশ্বাস (artificial ventilation) বা মুখের সাহায্যে শ্বাসকার্য বা mouth to mouth breathing চালাবার পর, গলার মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা অ্যাডামস অ্যাপেল বা থাইরয়েড কার্টিলেজের যে কোনও একপাশে গলার মাংসপেশির খাঁজে দু' আঙুল দিয়ে ক্যারোটিড ধমনীর স্পন্দন অনুভব করতে হবে। (চিত্র ৮) নাড়ীর স্পন্দন না পাওয়া

চিত্র ৮

গেলে, বুকের খাঁচার সবচেয়ে নিচের পাঁজর দু'টির মাঝখানে যেখানে এসে মিশেছে তার ঠিক দু' আঙুল উপরে বক্ষ অস্থির ওপর রোগীর শরীরের মধ্য রেখার ওপর (চিত্র ৯) নিজের এক হাতের তালুর শক্ত জায়গাটা রাখুন। এবার নিজে হাঁটু

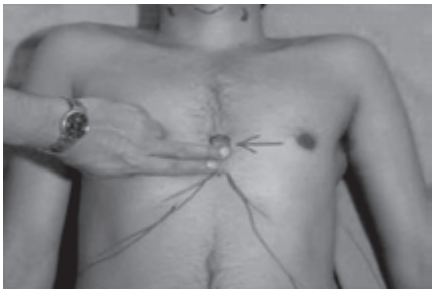

চিত্র ৯

মুড়ে বসে আপনার অন্যহাতের তালুটা ঐ হাতের তালুর ওপরে রাখুন। এবার নিজের কাঁধ থেকে সরলরেখায় এবং উল্লম্ব ভাবে বেশ জোরে নিচের দিকে চাপ দিন। চাপের চোটে যেন তাঁর পাঁজরগুলো এক ইঞ্চি মতো ভেতরে চেপে যায়। (চিত্র ১০) এই ভাবে বুকের উপর চাপ দেওয়ার নাম কার্ডিয়াক মাসাজ। নামটা মনে রাখার দরকার নেই, কিন্তু মনে রাখুন মিনিটে মোটামুটি

চিত্র ১০

আশিবার কার্ডিয়াক মাসাজ অর্থাৎ বুকে চাপ দেওয়ার কাজটা করতে হবে। তবে একটানা এক মিনিট চাপ দেবেন না। একসাথে তিরিশবার বুকে চাপ দেবার পরে দু'বার মুখে ফুঁ দিন (অর্থাৎ আপনার শরীর থেকে তাঁর শরীরে বাতাস ঢুকিয়ে দিন), তারপর আবার তিরিশবার বুকে চাপ, এইভাবে পালাক্রমে কার্ডিয়াক মাসাজ ও কৃত্রিম প্রশ্বাস চালু রাখুন যতক্ষণ না চিকিৎসক পাওয়া যায়, অথবা মানুষটির জ্ঞান ফিরে আসে।

সবক্ষেত্রে অবশ্য মুখে ফুঁ দেবার দরকার নেই। সম্প্রতি ২০১০ সালে ''আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশান'' ও ''ইন্টারন্যাশনাল লিয়াঁস কমিটি অন রিসাসিটেশান'' এর সুপারিশ অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তিকে আচমকা জ্ঞান হারাতে দেখা যায়, এবং তাঁর হৃদস্পন্দন বন্ধ থাকে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বুকে চাপ (কার্ডিয়াক মাসাজ) দিতে বলা হচ্ছে। একে বলে CCR বা (Cardio Cerebral Resuscitation)। তবে আবারও বলছি, খটোমটো নাম মনে রাখার কোনও দরকার নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে আচমকা জ্ঞান হারাবার প্রাথমিক কারণ হৃদযন্ত্রের বন্ধ হওয়া ধরা যেতে পারে, তাই মুখে ফুঁ অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে শ্বাস চালানোর দরকার নেই।

তবে শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত হৃদযন্ত্রের আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা প্রাথমিক কারণ হয়না। তাই সেক্ষেত্রে বুকে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসও চালু রাখতে হবে। আবার জলে ডোবা বা এমন ক্ষেত্রে যখন প্রাথমিক কারণ শ্বাসরোধ তখন বড়দের ক্ষেত্রেও শুধু বুকে চাপ দিলে চলবে না, মুখে ফুঁ অর্থাৎ কৃত্রিম শ্বাসও দিতে হবে।

সাধারণ ভাবে মুখে ফুঁ আর বুকে চাপের অনুপাত ২:৩০ বলে সুপারিশ করা হচ্ছে, তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ১:৩ এই অনুপাতে দিতে হবে। কারণ শিশুদের ক্ষেত্রে শ্বাস যন্ত্রের বা শ্বাসপথের সমস্যাই প্রাথমিক ধরা যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার মনে রাখবেন: তাদের শরীরে চাপ দেবেন আপনার দু'টি আঙুল মাত্র দিয়ে, সাধারণত তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে। আর চাপ দেবেন অনেক কম, শিশুর বুক মোটামুটি আধ ইঞ্চি বসে গেলেই যথেষ্ট।

তবে আবার বলি, কাছাকাছি ডাক্তার আসা পর্যন্ত এই পি সি আর পদ্ধতি চালিয়ে যাবেন। আপনার পদ্ধতি পুরো সঠিক না হলেও আপনি উদ্যোগ না নিলে কিন্তু অবধারিত ভাবে আরও একটা মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে, যা কখনই কাম্য নয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুব্রত গোস্বামী, এম বি বি এস, এফ আই পি পি, একটি সরকারি হাসপাতালে 'পেইন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট'-এর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন এবং মেডিকেল ইউনিট, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশান ও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল-এর মেম্বার

শিশুর গলায় কিছু আটকে গেলে...

গলায় কিছু আটকে গেলে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সে মৃত্যু কি আপনি ঠেকাতে পারেন? নাকি ডাক্তার ডাকতে দৌড়বেন? উত্তর দিচ্ছেন **শান্তিময় সৎপতি**।

অর্পিতা ও রাজর্ষি দুজনেই কলেজ শিক্ষক। ওদের একমাত্র সন্তান অপর্ণা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। সেদিন ছিল রবিবার। ওরা তিনজনে দূরদর্শনে ব্যঙ্গচিত্র দেখতে দেখতে খাচ্ছিল। হাসতে হাসতে হঠাৎ অপর্ণা চুপ করে গেল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কষ্টের কথা অপর্ণা বলতে পারে নি। ওর মা-বাবাও বুঝতে পারে নি কী হয়েছে। নাগরদোলায় চড়ে নিচের দিকে নামার সময় শরীর ওজনশূন্য হলে যে রকম অনুভূতি হয় সে রকম অনুভূতি অপর্ণার মা-বাবারও হচ্ছিল। কিন্তু ওরা দ্রুত বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠল। অর্পিতা মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে রাজর্ষিকে বললেন, 'চটপট গাড়ি বের কর।'

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পৌঁছোতে ওদের সাকুল্যে দশ মিনিট সময় লেগেছিল। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন বললেন, 'দুঃখিত' তখন ওদের পায়ের তলা থেকে মেঝেটা সরে গেল। অর্পিতা কাটা গাছের মতো মেঝেতেই পড়ে যেতেন যদি না পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইনটার্নি ওঁকে ধরে ফেলতেন। ডাক্তার অচেতন অর্পিতাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে পা দুটো উঁচু করে ধরে রাখতে বললেন রাজর্ষিকে।

অর্পিতা ও রাজর্ষি এখন নিয়মিত কলেজে যাচ্ছেন। কিন্তু ওদের জীবন থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেছে। যে দুর্ঘটনা অর্পিতা ও রাজর্ষির সুখী সংসার থেকে অপর্ণাকে কেড়ে নিল তার নাম শ্বাসরোধ (Choking)। অপর্ণা মা-বাবার সাথে দূরদর্শনে অনুষ্ঠান দেখছিল খেতে খেতে। খাবার পাকস্থলীতে যাবার আগে একটা চৌরাস্তার মোড় পার হয়। বাইরের দিকে নাক ও মুখ এবং ভিতর দিকে শ্বাসনালী ও গ্রাসনালী এই চারটা পথের মাঝখানে একটা সাধারণ জায়গা আছে যেটাকে চৌরাস্তার মোড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। শ্বাসনালী ও নাক সাধারণভাবে খোলা অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে মুখ ও গ্রাসনালী দরকার মতো খোলে ও বন্ধ হয়। আমরা যখন খাবার গিলতে চেষ্টা করি তখন উপজিহ্বা (epiglottis) শ্বাসনালীর মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে খাবার শ্বাসনালীতে না গিয়ে গ্রাসনালীতে ঢোকে। তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়া অথবা কথা বলা বা হাসার সময় খাবার গিলতে চেষ্টা করলে উপজিহ্বা সময় মতো খোলা ও বন্ধ করার কাজ করতে পারে না। ফলে শ্বাসনালীতে খাবার ঢুকে যাবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। অপর্ণাও একই সাথে দুটো কাজ করতে গেছল। তাই খাবারের টুকরো শ্বাসনালীতে আটকে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে অপর্ণা মারা যায়।

- **গলায় কিছু আটকে গিয়ে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে দ্রুত মৃত্যু হতে পারে**
- **শিশু বা বয়স্কের গলায় বস্তু আটকে মৃত্যু ডাক্তার ডাকার সময় দেয় না**
- **'হেমলিক কৌশল' সহজেই শিখে নিয়ে মৃত্যুকে প্রতিহত করা যেতে পারে**

এভাবে শ্বাসরোধ জনিত কারণে হামেশাই মত্যু ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরাই এরকম দুর্ঘটনার শিকার। খাবারের টুকরো খেলনা বা অন্য কোনো বস্তু শ্বাসনালীতে আটকে গেলে কী ঘটে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও উদ্ধারকাজ ভালোভাবে করা যায়। শ্বাসনালীতে বাইরের কোনো বস্তু আটকে গেলে পরিবেশ থেকে বাতাস ফুসফুসে এবং ফুসফুস থেকে বাতাস পরিবেশে যেতে-আসতে পারে না। ফলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি শ্বাস নিতে ও কথা বলতে পারেন না। তাই শরীরের কোষ ও কলা অক্সিজেন না পেয়ে নীল হতে থাকে। মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির চেতনা লোপ পায়। আর দুর্ঘটনা শুরুর মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। এজন্য অ্যাম্বুল্যান্স, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী অথবা চিকিৎসকের সাহায্য চাইবার অবকাশ মেলে না। তাহলে কোনো বস্তু আটকে শ্বাসরোধ হলে তার চরম পরিণতি কি মৃত্যু? উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' দুটোই হতে পারে। কীভাবে? আমরা এবার সেই আলোচনায় আসব।

১ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু এরকম দুর্ঘটনায় পড়লে তাকে পুরোবাহু বা উরুর উপর ১

১ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু এরকম দুর্ঘটনায় পড়লে তাকে পুরোবাহু বা উরুর উপর উবুড় করে (ছবি ১) শোয়াতে হবে যাতে শিশুর মাথা নিচের দিকে থাকে। এই অবস্থায় উদ্ধারকারী তাঁর হাতের তালুর গোড়া দিয়ে পিঠে দু-দিকের ত্রিভূজাকৃতি হাড়ের (অংসফলক) মাঝখানে পাঁচবার হাল্কা থাপ্পড় বা ধাক্কা দেবেন। বাধা দূর না হলে তৎক্ষণাৎ শিশুকে উল্টে নিয়ে (চিৎ করে) মাথা নিচের দিকেই রেখে দুআঙুলের সাহায্যে বুকের মাঝ বরাবর স্তনবৃন্ত দুটোর সংযোগ রেখা থেকে এক আঙুল নিচে (ছবি ২) পাঁচবার চাপ দিতে হবে। এতেও বাধা দূর না হলে শিশুর মুখের ভিতর পরীক্ষা করে দেখতে হবে বের করে দেবার মতো কোনো বস্তু আছে কিনা। না পেলে পুনরায় উবুড় করে পিঠে ধাক্কা দিতে হবে।

ছবি ১

ছবি ২

১ বছরের বেশি বয়সী দের ক্ষেত্রে উদ্ধারকারী বসে তাঁর উরু দুটোর উপর আড়াআড়ি উবুড় করে

ছবি ৩

শোয়াবেন (ছবি ৩) যাতে তার মাথাটা বুকের থেকে নিচের দিকে থাকে। তারপর আগে বলা উপায়ে পিঠে পাঁচবার ধাক্কা দেবেন।

ছবি ৪

বাধা দূর না হলে শিশুর পিছনে গিয়ে শিশুকে উঁচুতে রেখে অথবা হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতে হবে (ছবি ৪) এবার একহাতের চারটা আঙুল বন্ধ করে তর্জনির উপর বুড়ো আঙুল রেখে মুঠো করতে হবে (ছবি ৫)। মুঠোর ভিতরের দিক (আঙুলের দিকে) পেটের উপর রেখে মুঠোর পিঠে অন্য হাতের তালু রেখে ধরে নাভির উপরের দিকে কিন্তু পাঁজরের নিচের অংশে উর্দ্ধমুখী চাপ পাঁচবার দিতে হবে। বাধা দূর না হলে দেখতে হবে মুখের ভিতর বের করে দেবার মতো কোনো বস্তু আছে কি না। না পেলে পিঠের দিকে একই ভাবে আবার ধাক্কা দিতে হবে।

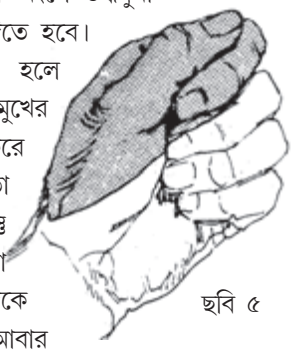

ছবি ৫

আরও বড়োদের ক্ষেত্রে উদ্ধারকারী দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর পেটের মাঝখানে একহাত রেখে নিজের দিকে টেনে রাখবেন এবং একইসঙ্গে অন্য হাতের তালুর গোড়া দিয়ে পিঠে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে এমনভাবে ঠেলে দেবেন যাতে ঐ ব্যক্তির মাথা ও মুখ সামনে নিচের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে। সোজা করে নিয়ে এরকম ধাক্কা বার পাঁচেক দেবার পর পিছন থেকে নাভির উপরদিকে কিন্তু পাঁজরের নিচের দিকে আগে বলা উপায়ে পাঁচবার উর্দ্ধমুখী চাপ দেবেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত তাঁর পিছনে/চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বা হাঁটুমুড়ে বসে (যেভাবে সুবিধা হবে) আগে বলা কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় থাকলে তাঁকে বসাতে বা দাঁড় করাতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা চলবে না। উবুড় হয়ে বা পাশ ফিরে থাকলে দ্রুত উল্টে দিতে বা চিৎ করে দিতে হবে। এবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির কোমরের দুপাশে পা দুটো রেখে উদ্ধারকারী হাঁটুমুড়ে শূন্যে অথবা কোমরের উপর বসবেন। তারপর নাভির উপরের দিকে কিন্তু পাঁজরের নিচে একহাতের তালু রেখে তার পিঠে অন্য হাতের তালু রেখে দ্রুত উর্দ্ধমুখী চাপ দেবেন। প্রয়োজনে বেশ কয়েকবার একই রকমভাবে চাপ দিতে হবে। এবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে মুখের ভিতর বের করে দেবার মতো কোনো বস্তু আছে কিনা।

উদ্ধারকারী ছোটো, দুর্বল বা রোগাটে গড়নের এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি বিশালাকায় হলে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে এই কৌশল প্রয়োগ করা যায় না। এক্ষেত্রে শোয়ানো অবস্থায় কৌশল প্রয়োগ সব থেকে সুবিধাজনক।

আবার কাছাকাছি কোনো উদ্ধারকারী বা সাহায্যকারী না থাকলে এই কৌশল নিজেই নিজের উপর প্রয়োগ করা যায়। টেবিলের কিনারায়, চেয়ারের পিছনে, রেলিং অথবা এজাতীয় অন্য কোনো বস্তুর উপর পেটের নির্দিষ্ট অংশ রেখে চাপ দিয়ে বিপন্মুক্ত হওয়া যায়।

এভাবে কৌশল প্রয়োগে কী হয়? পিঠের দিকে থাপ্পড় বা ধাক্কা দিলে শ্বাসকেন্দ্র উদ্দিপ্ত হয়ে ফুসফুসের কাজ শুরু হতে পারে। শ্বাসনালী বন্ধ হবার আগে ফুসফুস দুটোতে অনেকটা বাতাস থাকে। বুকে বা পাঁজরের নিচে চাপ দিলে/ উর্দ্ধমুখী চাপ প্রয়োগ করলে ফুসফুস দুটোতে থাকা বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে বেগে বেরিয়ে আসে। বাতাসের এই বেগ আটকে থাকা বস্তুকে ঠেলে মুখগহ্বরে নিয়ে আসে। মুখের ভিতর থেকে ঐ বস্তু বের করে দিলেই ব্যক্তি দুর্ঘটনামুক্ত হন।

'বহিরাগত বস্তুতে শ্বাসরোধ হলে তার পরিণতি কি মৃত্যু?' প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' দুটোই হতে পারে বলেছিলাম। শিশুদের ক্ষেত্রে এবং যিনি উদ্ধার কৌশল জানেন না তাঁর ক্ষেত্রে উদ্ধারকারী না থাকলে মৃত্যু ঘটবে। অন্য দিকে দুর্ঘটনাস্থলে সাহায্যকারী থাকলে বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি কৌশল জানলে মৃত্যু এড়ানো যাবে।

ছবি ৬

শ্বাসরোধ হলে একমাত্র হেমলিক কৌশলই পারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করতে। এই কৌশল শেখা এবং প্রয়োগ করার জন্য প্রথাগত শিক্ষা জরুরি নয়

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির উপরপেটে উর্দ্ধমুখী চাপ প্রয়োগে প্রাণরক্ষার তত্ত্ব ও কৌশল আবিষ্কার করেন জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের Advanced Clinical Science -এর অধ্যাপক ডা. হেনরি জে. হেমলিক (Dr. Henry J. Heimlich)। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে প্রাণরক্ষার এই উপায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'হেমলিক কৌশল' (Heimlich Maneuver)। শ্বাসরোধ হলে স্বরযন্ত্রের ভিতর বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয় বলে কথা বলা সম্ভব হয় না। এজন্য দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের গলার সামনে একহাতের আঙুল

প্রসারিত অবস্থায় (যেভাবে গলা টিপে ধরা হয়, ছবি ৬) রাখার পরামর্শও দিয়েছেন ডা. হেমলিক। এতে অন্যেরা বুঝতে পারবে যে ঐ ব্যক্তির দমবন্ধ হয়ে গেছে। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এই ইশারার নাম Heimlich Sign। তবে যিনি এই ইশারা জানেন না বা জানলেও দেখাতে পারছেন না তাঁর ক্ষেত্রেও দেখামাত্র লক্ষণের ভিত্তিতে দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। শ্বাসরোধের ঘটনা খাবার সময়, খাবার টেবিল বা খাবারের দোকানের কাছাকাছি ঘটে থাকে। এই অবস্থাগুলো মাথায় রাখলে শ্বাসরোধের সম্ভাবনার কথা দ্রুত ভেবে নিয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগানো যায়।

শ্বাসরোধের ঘটনাকে হার্ট-অ্যাটাক ভেবে ভুল করা চলবে না। হার্ট-অ্যাটাকের ক্ষেত্রে রোগীর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয় না। তাই তিনি বুকে ব্যথা অনুভবের কথা জানাতে পারেন। শ্বাসরোধের ঘটনা শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে যারা খুব কমক্ষেত্রেই হার্ট-অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়।

শ্বাসরোধ হলে একমাত্র এই কৌশলই পারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করতে। এই কৌশল শেখা এবং প্রয়োগ করার জন্য প্রথাগত শিক্ষা জরুরি নয়। তাই এই কৌশল যত বেশি মানুষকে শেখানো যাবে তত বেশি উদ্ধারকাজ করা যাবে। শুধু তাই নয় সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে। পরিণতির কথা আগাম জানা থাকায় শিশুদের হাতে গিলে ফেলার মতো খেলনা বা বস্তু কেউ দেবে না কিংবা দ্রুত খাবার চেষ্টা করবে না বা খেতে খেতে কথা বলতে বা হাসতে কেউ চাইবে না।

অর্পিতা ও রাজর্ষি উচ্চশিক্ষিত হয়েও একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে পারে নি। কারণ প্রথাগত শিক্ষাসূচীতে প্রয়োজনীয় জরুরি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় নি। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে এই ত্রুটি দূর করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সবাই উদ্যোগী হবে।

লেখক পরিচিতি : শান্তিময় সৎপতি একজন স্বাস্থ্যকর্মী ও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী। তিনি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিয়ে বহুদিন ধরে নানা পত্রপত্রিকায় লিখে আসছেন, এসব ব্যাপারে তাঁর কিছু পুস্তিকাও আছে।

Best Compliment from:

R K G PHARMA PVT. LTD.

'Profitability are the Companies **view**
Thousand company stand in the **queue**
Product Compositino is **new**
Competitors become **a few**
Govt. controls the **Price**
Maximum Company's **approach** is **nice**
Brand **non-available** decision is **wise**
Moral responsibility is of **no price**
We continue our **brand suffice**
Social responsibility is **one of** our **Goal**
Chose the **Company** for your valuable **poll'**

Visit us at : www.rkgpharmaindia.com
Mail at : rkgpharma12ez@gmail.com

শিশুর খাবার— দু'বছর বয়সের পরে

বাচ্চার খাওয়া না খাওয়া নিয়ে মা-বাবারে চিন্তার শেষ নেই। কীভাবে গড়ে তুলবেন আপনার বাচ্চার খাদ্যাভাস, জানাচ্ছেন **ডা. অতনু ভদ্র**।

খিদে খোলার ওষুধ দিন না...
কিছু খায় না...
আগে খেত, এখন না খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে...

রোজ শুনতে হয় এই রকম কথা। বৈজ্ঞানিক নয়, আবার উড়িয়ে দেওয়াও যায় না— শিশুর মা বলছে যখন।

সত্যটা কী?

দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হওয়ার পর একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পরিবর্তন আসে। খাদ্য 'গ্রহণ করা' থেকে বড় হয়ে ওঠে খাদ্য 'পছন্দ করা।' পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারটা অনেক সময়ই মায়ের নজর এড়িয়ে যায় এবং মা এখনও চেষ্টা করে আগের মতোই জোর করে করে খাইয়ে দিতে।

অনেক শিশুরা আগে স্কুলে যেত পাঁচ বছর বয়স থেকে— কিন্তু এখন ২-৩ বছর বয়সেই তারা স্কুলে যাওয়া শুরু করে। টিফিন খাওয়ার মাধ্যমে শিশুটির কাছে খাওয়া হয়ে ওঠে বন্ধুদের সাথে সামাজিক আদান-প্রদান। শিশুদের শারীরিক বিকাশ ও স্বাভাবিক খিদে বয়সের সাথে সাথে সমান ভাবে হয় না। প্রথম বছরের পর থেকে খিদে কমতে থাকে। এই খিদে কমে যাওয়াটা স্বাভাবিক। বাবা মায়েরা এই বয়সি বাচ্চাদের জোর করে খাওয়াতে যায়— তার ফলে খাওয়া হয়ে ওঠে যুদ্ধ।

যদিও সব শিশুই এক নয়— প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র, তবুও দেখা যায় ৪-৫ বছরের মধ্যে সাধারণত আবার খিদে বাড়ে। তবে কিছু শিশু তাদের পছন্দ-অপছন্দ ছাড়িয়ে উঠতে পারে না— এবং অনেক বয়স পর্যন্ত Picky Eater/ Fussy Eater থেকে যায়।

৩-৫ বছর বয়স পর্যন্ত ওজন গড়ে ২ কিলোগ্রাম এবং উচ্চতা গড়ে ৬-৮ সেন্টিমিটার বাড়ে। এই সময় দাঁতের সমস্যা এবং লৌহের ঘাটতি শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। অনেক সময় লৌহের ঘাটতির জন্য শিশুরা স্কুলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এই বয়সে পরিবেশগত কারণে শিশুরা মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ে বিভিন্ন ভাইরাস জনিত বা অন্যান্য সংক্রামক রোগে।

খাবার সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ভুল ধারণা শিশুদের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আমরা ভাবি, কিছু খাবার 'ভারী', কিছু বা 'গরম' বা 'ঠান্ডা'। মাছ, ডিম, সয়াবিন খেতে হবে। নিরামিষাশী হলে ছানা, দই, পনির, সয়াবিন অবশ্য খেতেই হবে। এছাড়াও মাংসের 'মেটে' খাওয়ার বাড়তি সুবিধা নেই, বরং শারীরিক অসুবিধা হতে পারে। রঙিন সব্জি, ফল সঠিক পরিমাপে খেতে হবে।

তার সাথে মাথায় রাখতে হবে শিশুটির পছন্দ: লুচি, পরটা, কেক, চাউমিন ইত্যাদি। অর্থাৎ খাওয়াটা যেন শিশুর ভালো লাগার সাথে খাপ খায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. অতনু ভদ্র, এম বি বি এস, ডি সি এইচ শিশুরোগবিশেষজ্ঞ। একটি সরকারী হাসপাতালে শিশুচিকিৎসক।

চিকিৎসা পণ্য নয়, মানবিক অধিকার

জ্বর-জ্বালা

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বা 'অজানা জ্বর'— আমাদের চারপাশে এদের অশরীরী অধিষ্ঠান। মিডিয়ার প্রচারে মানুষ খুব ভয়ও পায়। জ্বর মানে শিয়রে শমন। এখন কত কি নতুন নতুন রোগ বেরিয়েছে যে! ডাক্তারবাবু, ওষুধ খেলেও জ্বর নামছে না, নামলেও আধঘন্টার মধ্যে আবার যে কে সেই, মাথায় জ্বর উঠে গেলে তো স্ট্রোক হয়ে যাবে। ওষুধ চাই, দামি ওষুধ, জ্বর নামাবে গ্যারান্টিড, তবেই তো তুমি বড় ডাক্তার! এ হল জ্বর জবরদস্তি, হোমরা-চোমরা অফিসে বস চুপসে এতটুকু, নাক উঁচু সুন্দরীদের চোখের কোনে কালি। ডাক্তারবাবু, ওষুধের দোকান, ওষুধ কোম্পানীগুলি দু'হাতে লোটে। জ্বর যার— ওষুধ তার। পাঁচ সাত রকমের ওষুধ ছাড়া জ্বর কমবে কি করে? লিখেছেন **ডা. পার্থপ্রতিম পাল**

প্রতিদিনকার অভ্যাসে এই কান্ডকারখানা আর আর্তনাদ গা সওয়া হয়ে গেছে। জ্বর নিয়ে জারি করা এই ভীতিটাকে সচেতনতা বলে ভুল করলে চলবে না। মানুষের বোঝায় যদি অস্বচ্ছতা থাকে— তাতে বিপ্রতীপ সিদ্ধান্ত মনে আসতেই পারে। বোঝা দরকার জ্বর কোন রোগ নয়, অন্য কোন রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে জ্বর-সৃষ্টিকারী রোগগুলি থেকে বড় কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের আলোচনা শুরু হোক এই স্বতঃসিদ্ধ থেকে।

জ্বর হয়েছে তো ভয় কিসের?

যেমন এক হাঁড়ি ভাত রাঁধতে উনুন জ্বালাতে হয়, তেমন সেই ভাত হজমের উপযুক্ত করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণায় ভেঙে ফেলতে দেহে উৎপন্ন হয় তাপ। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন চললে যেমন গাড়ি গরম হয়ে যায় তেমনি কাজকর্ম, চলাফেরা করলেও পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণে দেহে উৎপন্ন হয় তাপ। শীতকালে পরিবেশের তাপমাত্রা কমে গেলে দেহের তাপমাত্রাও কমে যাওয়ার কথা। দেহ যাতে অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যেতে না পারে তাই পরিবেশে তাপ বিকিরণ করে বা পরিবেশ থেকে তাপ গ্রহণ করে শরীরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কাজটি পরিচালনা করে মস্তিষ্কের একটি অংশ— হাইপোথ্যালামাস, যে তাপমাত্রায় দেহ ঠিকঠাক কাজকর্ম করতে পারে, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলির অনুকূল সেই তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয় হাইপোথ্যালামাসকে। সেটাই হচ্ছে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা।

চিকিৎসাবিদ্যা হচ্ছে ব্যক্তিনির্ভর বিজ্ঞান। সকলের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এক হয় না। কারও কম বা কারও বেশি। মোটামুটি অ্যাভারেজ বা গড় ধরে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি-বিশেষে এর ব্যতিক্রম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জ্বর বলতে কি বোঝায়?

সাধারণত বাহুমূলে (বগলে) বা জিভের তলায় থার্মোমিটারের পারদ অংশটি রেখে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। বাহুমূলে 96-98.2^{0}F হচ্ছে স্বাভাবিক তাপমাত্রা। দিনের বিভিন্ন সময়ে দেহের তাপমাত্রা বিভিন্ন হতে পারে। সকাল ছ'টায় 97.9^{0}F-এর বেশি বা বিকাল চারটায় 98.9^{0}F-এর

বেশি তাপমাত্রা হলে জ্বর হয়েছে বলা যায়। জিভের তলায় তাপমাত্রা মাপা হলে উপরের তাপমাত্রাগুলি সবক্ষেত্রেই 1^{0}F করে বাড়িয়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরা হবে 97-99.2^{0}F । সকাল ছ'টায় 98.9^{0}F-এর বেশি বা বিকাল চারটায় 99.9^{0}F-এর বেশি তাপমাত্রা পাওয়া গেলে জ্বর হয়েছে বলা যাবে।

শিশুদের বা অজ্ঞান ব্যক্তির তাপমাত্রা অনেক ক্ষেত্রে মলদ্বারে মাপা হয়। সেক্ষেত্রে বাহুমূলের তুলনায় 2^{0}F অথবা জিভের তলার তুলনায় 1^{0}F বেশি তাপমাত্রাকে শরীরের তাপমাত্রা হিসাবে ধরা হয়।

কেমনভাবে জ্বর মাপবেন?

প্রতিবার ব্যবহারের পর সাবান জলে থার্মোমিটারটি ধুয়ে নিতে হবে। গরম জল ব্যবহার করা চলবে না। বাহুমূলে জ্বর দেখা হলে সেখানটি শুকনো কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে নিতে হবে। বাহুমূলে অথবা জিভের তলায় থার্মোমিটারের পারদ অংশটি অন্তত দু'মিনিট রাখতে হবে। জ্বর মাপার ঠিক আগে পেটভরে খাওয়া বা গরম কিছু খাওয়া চলবে না। নেশার জিনিস বন্ধ রাখতে হবে।

চারঘন্টা অন্তর জ্বর মেপে লিখে রাখতে হবে, স্বাভাবিক তাপমাত্রা পাওয়া গেলেও লিখে রাখতে হবে। এই তাপমাত্রা-সারণি রোগ নির্ণয়ে ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করবে।

যেখানে সংক্রমণের ভয় সেখানেই জ্বর হয়

আগেই বলা হয়ে গেছে যে জ্বর আসলে কোন রোগ নয়, রোগলক্ষণ মাত্র। বিভিন্ন কারণে জ্বর হতে পারে। তবে প্রধান কারণ হচ্ছে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ। অন্য যে সমস্ত কারণে জ্বর হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব।

সংক্রমণ বা ইনফেকশন হলে কি হয়?

দেহে বাইরের জীবাণুরা ঢুকে পড়লে শ্বেত রক্তকণিকার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অনবরত সম্পাদনে উৎপন্ন হয় তাপ, ফলে দেহের তাপমাত্রা বাড়ে— আসে জ্বর।

ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাসরা যুদ্ধে হেরে গেলে জ্বর কমে যায়। আবার ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাসরা দেহে টিকে গেলে জ্বর চলতে থাকে। এদের দেহ নিঃসৃত রসের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয় 'পাইরোজেন', পাইরোজেন হাইপোথ্যালামাসের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে

এলোমেলো করে দেয়, ফলে জ্বর আসে।

ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাসরা 'শ্বেতকণিকা-গুলিকে' প্রতিরোধ করে দেহে থেকে গেলেও তাদের হারিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া অনবরত চালু থাকে। তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে জ্বর কমে যায়। কোন কোন সময়ে বাইরের রাসায়নিকের সাহায্য নিয়ে জীবাণুদের হারাতে হয়। সেটাকেই বলে ওষুধ। কোন কোন ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস আপনা থেকেই ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়— জ্বর ভাল হয়ে যায়।

জ্বর হলে তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জ্বর হচ্ছে সুস্থ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকাশ।

জ্বর হলে কি করতে হবে?

বেশি মাত্রায় জ্বর এলে (102^0F বা কাছাকাছি) যে সমস্ত অঞ্চল ম্যালেরিয়া প্রবণ সেখানকার রোগীদের প্রথম দিন-ই বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আঙুলের ডগা থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে রক্তের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার। ম্যালেরিয়া হলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

ম্যালেরিয়া না হলে 102^0F পর্যন্ত জ্বরে জ্বর কমাবার ওষুধ দেবার দরকার নেই, তবে অসহ্য মাথাযন্ত্রণা বা পেশী যন্ত্রণা, গাঁটযন্ত্রনা ইত্যাদি থাকলে কম জ্বর থাকলেও ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। ওষুধ বলতে প্যারাসিটামল।

কষ্ট সহ্য করতে পারলে জ্বর বা ব্যথা কমাবার দরকার নেই। জ্বর হচ্ছে দেহের প্রতিরক্ষা পদ্ধতি। বেশি তাপমাত্রাতে জ্বর-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস মারা যায়। তখন আপনাআপনিই জ্বর সেরে যাবে।

আরও বেশি জ্বর হলে (103^0F বা তার আশেপাশে) জ্বর কমাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীর জামাকাপড় আলগা করে দিতে হবে অথবা যতটা সম্ভব পোশাক খুলে দিতে হবে। অল্প গরম জলে গা হাত পা মাথা ধুইয়ে দিয়ে হাওয়া করতে হবে।

কোন কারণে কাঁপুনি হলে রোগীকে চাদর বা কম্বল চাপা দেওয়া দরকার।

জ্বর কমাবার ওষুধ

জ্বর কমাবার ভাল ও নিরাপদ ওষুধ হচ্ছে প্যারাসিটামল। জন্ডিস বা যকৃতের কোন রোগ থাকলে বা প্যারাসিটামলে অ্যালার্জি থাকলে অবশ্য ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না।

পূর্ণবয়স্ক ও স্বাভাবিক ওজনের একজন মানুষ ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত প্যারাসিটামল ৬ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করতে পারে। শিশুদের বা কম ওজনের রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১৫ মিলিগ্রাম/প্রতি কেজি দেহের ওজন, ৬ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করলে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এ কথা জেনে রাখা দরকার এর চেয়ে বেশি পরিমাণে প্যারাসিটামল ব্যবহারে যকৃতের ক্ষতি হতে পারে। তা থেকে এমন কি মৃত্যু হবার আশঙ্কাও থেকে যায়।

জ্বরের প্রথম তিন দিনে ম্যালেরিয়ার জন্য আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা (স্লাইড টেস্ট) করা ছাড়া অন্য কোন রক্ত পরীক্ষার দরকার নেই। তবে জ্বরের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত উপসর্গ থাকলে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিতে হবে।

- **জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি, অজ্ঞান বা আচ্ছন্ন হওয়া**
  মস্তিষ্ক বা সুষুম্না কাণ্ডের প্রদাহে হতে পারে। যেমন—মেনিনজাইটিস,এনকেফেলাইটিস। ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে। ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হবে।
- **জ্বরের সঙ্গে মাথাযন্ত্রণা, বমি এবং কানে পূঁজ**
  সর্দি হলে/নাক বুজে গেলে কানের পর্দা ফুটো হয়ে কানে পূঁজ হতে পারে । সংক্রমণ মস্তিষ্কে পৌঁছে গেলে মাথাযন্ত্রণা বমি ইত্যাদি শুরু হয়। কানে পূঁজ প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসা করলে সেরে যায়। তবে চিকিৎসা না করলে সংক্রমণ মস্তিষ্কে পৌঁছলে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়।
- **জ্বরের সঙ্গে গায়ের চামড়ায় লাল লাল বা কালচে দাগ**
  চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ থেকে এমনটা হয়। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জ্বরে হতে পারে। ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হতে পারে।
- **জ্বরের সঙ্গে গায়ে র‍্যাশ বেরনো ও চাকা চাকা দাগ**
  হাম, বসন্ত, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ইত্যাদি রোগে গায়ে র‍্যাশ বেরতে পারে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তবে এর সঙ্গে চামড়ার নীচে লালচে বা কালো কালো রক্তক্ষরণের দাগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে। ভর্তি করে চিকিৎসা দরকার হতে পারে।
- **জ্বর ও এক বা একাধিক গাঁট ফুলে যাওয়া**
  বিভিন্ন বাতের রোগে হতে পারে। চিকুনগুনিয়াতেও হতে পারে। তবে ছোটদের ক্ষেত্রে হলে রিউম্যাটিক জ্বর হতে পারে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হলেও হতে পারে।
- **জ্বর ও গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া**
  সর্দিকাশিতে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সংক্রমণে এ রকম হতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। তবে রক্তের লিউকিমিয়া বা লিম্ফোমা ইত্যাদি রোগেও এরকম হয়। তখন খুব তাড়তাড়ি চিকিৎসা শুরু করতে হবে। ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে।
- **জ্বর ও প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাবের রং পরিবর্তন**
  প্রস্রাবের নালি বা কিডনি সংক্রান্ত রোগ হতে পারে। বাড়িতে রেখে চিকিৎসা সম্ভব। তবে প্রয়োজনে ভর্তি করতে হতে পারে।
- **জ্বর ও শ্বাসকষ্ট, কাশি**
  ফুসফুসের বা শ্বাসতন্ত্রের অন্য কোন অংশের সংক্রমণ/প্রদাহ হলে হয়। সাধারণত বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তারবাবু সিদ্ধান্ত নেবেন ভর্তি করতে হবে কি না।
- **জ্বর ও বারবার পায়খানা, পেটে মোচড় দিয়ে যন্ত্রণা**
  আন্ত্রিক বা কোলাইটিস বা খাদ্যনালীর প্রদাহে বা সংক্রমণে এমনটা হতে পারে। সাধারণত বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা সম্ভব।

তিনদিন জ্বর চলছে— কী করা উচিত?

ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে। ডাক্তারবাবু প্রয়োজনে জীবাণু মারার ওষুধ ব্যবহার করবেন। তবে কাশির সিরাপ, ভিটামিন, এনজাইম— এ সবের দরকার নেই। শ্বাসকষ্ট থাকলে মুখ দিয়ে টানার ওষুধ যেমন ইনহেলার বা রোটাহেলার

দেওয়া যেতে পারে। উপসর্গ অনুযায়ী বাড়তি দু-একটা ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে।

তিনদিন জ্বর থেকে গেলে আরেকবার ম্যালেরিয়া আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা (স্লাইড টেস্ট) ও রক্তের অণুচক্রিকার গণনা (প্লেটলেট কাউন্ট) করতে হবে। রক্তের ও প্রস্রাবেব রুটিন (সাধারণ) পরীক্ষাও করা উচিত। বুকের এক্সরে করতে হতে পারে।

জ্বর তাতেও না কমলে এবং সাতদিন পেরিয়ে গেলে—

আবার ম্যালেরিয়ার স্লাইড টেস্ট, রক্তের সাধারণ পরীক্ষা ও প্লেটলেট কাউন্ট, সঙ্গে টাইফয়েডের জন্য ভিডাল পরীক্ষা করাতে হবে। অনেকে জ্বরের প্রথম দিকেই ভিডাল পরীক্ষা করান। তবে জ্বর অন্তত সাতদিন না পেরোলে ভিডাল পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব নয়।

এছাড়াও ডাক্তারবাবুরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করাতে পারেন। জ্বর দু'তিন মাস থাকার পরেও হাজার পরীক্ষানিরীক্ষা করে কোন রোগ নির্ণয় করা গেল না— এমনটা হতেই পারে, তবে জ্বর যত বেশিদিন থাকবে তত লক্ষণ অনুযায়ী অনেক অনেক পরীক্ষা করাতে হতে পারে। অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, এলাইজা ইত্যাদি পরীক্ষার খরচ অনেক, এ সমস্ত পরীক্ষায় ত্রুটিপূর্ণ পজিটিভ বা নেগেটিভ নির্ণয় আসতে পারে। এছাড়া এ সমস্ত পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ে শেষ কথা নয়। তাই পরিস্থিতি বিচার করে একান্ত বাধ্য না হলে সাধারণত এ সমস্ত পরীক্ষা করা হয় না। জ্বর সারছে না বলে আগে কোন পরীক্ষা হয় নি তাই সব পরীক্ষা একসঙ্গে করার নিদান দিলাম— এটাও ঠিক নয়।

জ্বর ও শিশুদের তড়কা

দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে শিশুদের কারও কারও মৃগীর মত খিঁচুনি বা তড়কা হয়, একে বলে ফেব্রাইল কনভালসন। এতে ভয়ের কিছু নেই। দেখতে হবে জ্বর যেন কিছুতেই 101^0F-এর বেশি বেড়ে না যায়। এদের জ্বর 100^0F ছাড়াবার আগেই সঠিকমাত্রায় প্যারাসিটামল দিয়ে দিতে হয়। প্রথম দিনেই জ্বরের প্রকোপ বেশি দেখা যায়, তাই প্রথম দিনে জ্বর ওঠার জন্য অপেক্ষা না করে ৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর ওষুধ দিয়ে যাওয়া উচিত। পরের দিন থেকে জ্বর বাড়ছে দেখলে প্রয়োজন অনুযায়ী এই ওষুধ দিতে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামলের সঠিক মাত্রা হচ্ছে ১৫ মিলিগ্রাম/প্রতি কেজি ওজন। ৬ ঘন্টা অন্তর এই ওষুধ দেওয়া যায়। তার বেশি নয়।

মনে রাখতে হবে বিচার বিবেচনা করে একজন ডাক্তারবাবুই এই রোগ নির্ণয় করতে পারেন। তবে জ্বরের সঙ্গে তড়কা হলেই সেটা ফেব্রাইল কনভালসন ভাবার দরকার নেই। মেনিনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস, মৃগী ইত্যাদি রোগও একই রকম লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে। জ্বর নিয়ন্ত্রণ না হয়ে যদি কোন কারণে খিঁচুনি এসে যায় তবে শিশুকে ডায়াজিপাম খাইয়ে বা পায়ুতে ডায়াজিপাম ওষুধ দিয়ে খিঁচুনি কমানো হয়। দীর্ঘমেয়াদী খিঁচুনি-প্রতিরোধক ওষুধ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না।

একটু বড় হয়ে গেলে (৫-৭ বছর) শিশুদের এই রোগ সাধারণত আর হয় না।

সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক

যাদের অতিরিক্ত গরমে দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করতে হয় (যেমন অ্যাথলেট, ট্রাফিক পুলিশ ইত্যাদি) বা হঠাৎ করে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা প্রচুর বেড়ে গেলে বিশেষত বয়স্কদের ও শিশুদের সানস্ট্রোক বা হিট স্ট্রোক হতে পারে। এ অবস্থায় দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কোষকলার প্রোটিন, ফসফোলিপিড, লাইপো-প্রোটিন, ইত্যাদির গঠনে পরিবর্তন হয়। হৃদযন্ত্র ও অন্যান্য দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। এ সমস্ত কারণে মানুষ মারা যেতে পারে। কতটা তাপমাত্রা বাড়লে বা বর্ধিত তাপমাত্রা কতক্ষণ থাকলে একজন মারা যেতে পারে— এটা ব্যক্তিনির্ভর। দেখা গেছে কারও হৃদযন্ত্র 106.5^0F-এ বিকল হয়ে গেছে আবার কেউ 114^0F পর্যন্ত জ্বর বাড়লেও আবার সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পেরেছে।

সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক হলে কী করতে হবে?

যতদূর সম্ভব পোশাক খুলে দিন। সাধারণ তাপমাত্রার জলে স্নান করিয়ে দিন (বরফজল বা বরফ দেবেন না), ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিন, হাওয়া করুন। দেহ শুকিয়ে গেলে আবার ভিজিয়ে দিন— এভাবে শরীরের তাপমাত্রা কমান। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। জানা দরকার হিটস্ট্রোকে প্যারাসিটামল ওষুধ জ্বর কমাতে পারে না।

ডায়াজিপাম বা ক্লোরপ্রামাজিন জাতীয় খিঁচুনি কমাবার ওষুধ ব্যবহার করতে হতে পারে।

জ্বর হলে দুর্বলতা অরুচি হয় কেন?

জ্বর হলে খিদে কমে যায়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ খিদে পাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। খাবার খেলে খাবার হজম করার জন্য তাপ উৎপন্ন হবে তা শরীরে তাপমাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। সে কারণে খিদে কমে যায়।

জ্বর হলে গা-হাত-পা ব্যথা-যন্ত্রণা হয়, মাথা যন্ত্রণা হয়, শরীর দুর্বল লাগে। এ সমস্ত কারণে আমরা বিশ্রাম নিতে বাধ্য হই। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার জন্যই এ সব ঘটে থাকে। কাজ করলে মাংসপেশীর সংকোচন-প্রসারণ তাপ তৈরি করে দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। জ্বর হলে তাই বিশ্রাম নিতে হবে, সহজ-পাচ্য খাবার খেতে হবে আর বেশি জল খেতে হবে— এভাবে শরীরের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে পারি।

জ্বর হলে ভাত খাওয়া যায়?

খুব খাওয়া যায়। বাড়িতে তৈরি সহজে হজম হয় এ রকম যে কোন খাবার খেতে কোন বাধা নেই। সঙ্গে জল বা তরল জাতীয় জিনিস (স্টু, ফলের রস ইত্যাদি) বেশি করে খেতে হবে। জ্বরের জন্য বিভিন্ন কারণে তৈরি হওয়া শরীরের পক্ষে বিষাক্ত পদার্থগুলি জল বা তরলের মাধ্যমে দেহের বাইরে চলে যাবে।

অন্য যে সমস্ত কারণে জ্বর আসতে পারে—

সংক্রমণ থেকে জ্বর কিছুদিনের মধ্যেই সেরে যায়। রোগ নির্ণয় করা গেল না এমন কোন কোন জ্বর অনেকদিন থেকে যেতে পারে। এছাড়াও কতকগুলি রোগে অনেকদিন জ্বর থাকে।

শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যখন নিজেই শরীরের অন্য কোষকলার সঙ্গে যুদ্ধ করে এমন কিছু স্বপ্রতিরোধী বা অটো-ইমিউন রোগে (যেমন সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমেটোসাস এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস) দীর্ঘদিন জ্বর চলতে পারে। এ ধরনের রোগে অন্য লক্ষণের সঙ্গে এক বা একাধিক গাঁট ফোলা ও যন্ত্রণা হয়। ওষুধ খেলে রোগ ভাল থাকে তবে পুরো ভাল হয়ে যায় না।

ফুসফুসে বা দেহের অন্য কোন অঙ্গে যক্ষ্মা হলে (যক্ষ্মা একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ) দীর্ঘদিন জ্বর চলতে পারে। রক্তপরীক্ষা, বুকের এক্সরে, কফ পরীক্ষা, ফোলা থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা (FNAC) বা কোষকলা কেটে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করা হতে পারে— একান্ত দরকার হলে। শেষেরটি খরচসাপেক্ষ পরীক্ষা।

ক্যানসার বা কর্কট রোগে অনেকদিন জ্বর চলতে পারে। পরীক্ষা-পদ্ধতি অনেকটা যক্ষ্মারই মত। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে এ রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাওয়া সম্ভব।

আঘাতজনিত জ্বর

বড় ধরনের চোট, হাত ভাঙা বা পেশীতন্তু ছিঁড়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া— এসব ক্ষেত্রে আঘাতজনিত জ্বর হয়। দু'তিন দিনের মধ্যে জ্বর ভাল হয়ে যায়। প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন ইত্যাদি ব্যথার ওষুধ খেলে জ্বর ও ব্যথার উপশম হয়।

জ্বরের সাতকাহন শেষে আরো কিছু বলার আছে। দু'-এক হাজার শব্দের এই নিবন্ধটিতে অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল। দু'-এক হাজার পাতার বইয়েও অবশ্য অনেক কিছু বাকি থেকে যাবে। চিকিৎসাবিদ্যা সতত পরিবর্তনশীল, নতুন জ্ঞান আর প্রযুক্তিতে আলো পড়ছে অনেক অন্ধকার কোণে। শুধু আধুনিক জ্ঞান আর প্রযুক্তি নিয়ে কচকচানি করে লাভও নেই। দরকার হচ্ছে সংবেদনশীল মন নিয়ে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ। যা কিছু তোমার আছে সেটা নিয়েই যুদ্ধে জিততে হবে— যা অসম্ভব নয়। ঝাঁ-চকচকে নার্সিংহোম, আলো- আড়ম্বর, বড় ডাক্তারবাবু, বড় খরচ, দামী পরীক্ষা— এ সমস্ত রোগ নিরাময়ের উপরে কোন প্রভাব ফেলে না— আসল কথা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা— সাধারণত যা করতে খরচ বেশি লাগে না। এই উপলব্ধির দরকার আছে। জ্বরে জর্জরিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এ চিকিৎসকের নিবেদন এটা।

লেখক পরিচিতি: ডা. পার্থপ্রতিম পাল, এম বি বি এস, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি হাওড়া জেলায় শ্রমজীবী মানুষদের জন্য যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা-পরিষেবার এক কেন্দ্রে যুক্ত আছেন বহু বছর।

advt.

Acne, HairFall,Vitiligo – Do **NOT** Despair.

All are Treatable.

Consult your Dermatologist

ALKEM DERMA CARE

(Adding Value to Skin Care)

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পি সি ও এস

কিশোরীরা আসে ঋতুচক্রের নানা সমস্যা নিয়ে; অনেক সময়ে আতঙ্কিত মা-বাবারা দৌড়ে আসেন মেয়ের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে বলে। বিবাহিত মহিলারা আসেন মাসিকের গোলযোগ নিয়ে, আরও বেশি আসেন সন্তান ধারণে অক্ষমতার কারণে। আর সকলেই আসেন মুখে অবাঞ্ছিত লোম, ব্রণ আর ঘাড়ে-বগলে-কুঁচকিতে চামড়ায় কালো দাগ নিয়ে। রোগটির নাম পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম, সংক্ষেপে পি সি ও এস। রোগ ও চিকিৎসার সুলুক-সন্ধান দিচ্ছেন **ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়**।

বছর কুড়ির কলেজে পড়া মেয়েটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আমার এক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বন্ধু। তার সারা মুখে ব্রণ, মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে আর কিছুদিন যাবৎ মুখের লোমগুলো বেড়ে উঠে বড় খারাপ দেখাচ্ছে। আমার কাছে এসে মেয়েটি একেবারে কেঁদে ফেলল, আর তার মা জানালেন, 'ডাক্তারবাবু ওর পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে। কি সর্বনাশ বলুন তো!'

সর্বনাশ অবশ্য কিছু হয় নি। হয়েছে একটা রোগ, বা সাধু বাংলায় বলতে গেলে রোগ-সংলক্ষণ। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। ইদানীং এই একটা অসুখের কথা ১৪ থেকে ৪০ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে খুবই শোনা যায়। এই অসুখ বিভিন্ন বয়সি মহিলাদের কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। এই নামটির মধ্যে এমন কয়েকটি কথা আছে যা নিয়ে চিকিৎসক ও জনমানসে বিভ্রান্তি কাজ করে।

তরুণীর মুখে অবাঞ্ছিত লোম

প্রথমেই বলে রাখি সাধারণ সিস্ট (cyst) বলতে (জল ভর্তি টিউমার) আমরা যা বুঝি এই অসুখে তা মোটেই থাকে না ওভারি বা ডিম্বাশয়ে। আসলে বিশেষ্য আর বিশেষণের তফাতটা একটু বোঝা দরকার। ওভারিয়ান সিস্ট- ওভারির এক ধরনের টিউমার- একটি বিশেষ্য আর 'সিস্টিক' ওভারি- ওভারির বিশেষণ। এখানে ওভারিটি কেমন দেখতে তাই বোঝাচ্ছে।

স্বাভাবিক ঋতুচক্রে ডিম্বাশয়ের (ovary) মধ্যে ডিম্বকোষগুলি (follicles) ক্রমাগত বেড়ে একসময় ফেটে যায় ও ডিম্বনিঃসরণ (ovulation) হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না হয়ে যেহেতু ডিম্বকোষগুলি একটা পর্যায়ের পর আর বাড়ে না এবং ডিম্বনিঃসরণও হয় না- তাই তারা ছোট ছোট 'সিস্ট' হিসাবে ডিম্বাশয়ের মধ্যে জমে যায় ও ওভারিকে দেখায় 'সিস্টিক'। অনেকগুলি ছোট ছোট সিস্ট তাকে তাই 'পলি সিস্টিক।' নামের ব্যাপারটা না বুঝলে বিভ্রান্তি ঘটবে, রোগী ভয় পাবে, 'আমার ওভারিতে সিস্ট হয়েছে- অপারেশন দরকার বোধহয়' - ইত্যাদি ভেবে। আসলে এই অসুখটি এক ধরণের endocrinopathy, অর্থাৎ হরমোন ঘটিত অসুখ এবং কেবলমাত্র ডিম্বাশয়ের অসুখ নয়।

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে স্টেইন ও লেভেন্থাল সাহেবরা এই অসুখটির কথা প্রথম বলেছিলেন। মেয়েদের অস্বাভাবিক লোমের আধিক্য (hirsutism), অনেকদিন পর পর মাসিক হওয়া, (oligomenorrhoea) ও অস্বাভাবিক স্থূলতা (obesity)- এইগুলিকেই তাঁরা এই রোগের নিদর্শন হিসাবে স্থির করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ডিম্বনিঃসরণ অনিয়মিত বা একেবারেই না হওয়া (oligo- or an-ovulation) ও শরীরে পুরুষ যৌন হরমোনের (androgen) আধিক্য দিয়ে এই রোগের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়। গর্ভধারণে সক্ষম (অর্থাৎ ১৪ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক) মহিলাদের শতকরা ৫-১০ ভাগ এই অসুখে ভোগেন। বর্তমানে এই রোগের প্রকোপ ক্রমবর্দ্ধমান।

যদিও ডিম্বনিঃসরণ না হওয়া বা কম হওয়াই এই অসুখের মূল লক্ষণ- কিন্তু কেন সেটা হয় সেটা সঠিক ভাবে জানা যায় না। শরীরে বা মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস ও পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নির্গত বিভিন্ন ডিম্বাশয় উদ্দীপক হরমোনের (gonadotrophin) মাত্রা ঠিক মতো না হওয়ায় তারা ডিম্বাশয়ের উপর অস্বাভাবিক ভাবে কাজ করে। তার ফলে ডিম্বনিঃসরণ হয় না এবং ডিম্বাশয় থেকে অতিরিক্ত পুরুষ যৌন হরমোন বেরোতে থাকে। আরেকটি লক্ষণীয় ঘটনা হচ্ছে অগ্ন্যাশয় (pancreas) থেকে নির্গত ইনসুলিন নামক হরমোনের মাত্রা রক্তে বেড়ে যায়। আসলে ইনসুলিন শরীরে ঠিকমতো ব্যবহৃত হতে পারে না বলেই রক্তে তার মাত্রা বেশি হয়ে যায়।

যাঁরা এই অসুখে ভোগেন তাঁদের মধ্যে কম বয়সিরা সাধারণত আসেন অনিয়মিত মাসিক ও শারীরিক স্থূলতা নিয়ে। বিবাহিত মহিলারা আসেন অনিয়মিত মাসিক ও বন্ধ্যাত্বের সমস্যা নিয়ে। এই অসুখের প্রায় ৫০ ভাগেরও বেশি মহিলার শারীরিক স্থূলতা থাকে। সাধারণভাবে স্থূলতার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় শারীরিক ভর সূচক বা Body Mass Index (BMI) দিয়ে। BMI ঠিক হয় শরীরের ওজন (কি গ্রা) ও উচ্চতার (মিটার) বর্গের অনুপাত দিয়ে। (weight in Kg/height in m^2) এই অনুপাত ২৫ বা তার বেশি হলে বলা হয় অধিক ওজন (overweight)। আর ৩০ বা

তার বেশি হলে তাকে বলা হয় স্থূলতা (obesity)। এই শারীরিক স্থূলতা লক্ষ্য করা যায় তলপেট/নিতম্ব অঞ্চলে- একে বলে শরীরমধ্য স্থূলতা (midline obesity)। শরীরে পুরুষ যৌন হরমোনের বৃদ্ধির জন্য লোমের আধিক্য হয়। মুখমন্ডলী ছাড়াও স্তন, পেট, উরু এবং হাতে-পায়ে বেশি লোম দেখা যায়। এছাড়াও মুখে ব্রণ ও ঘাড়ের চামড়ায় একধরনের কালো দাগ দেখা দিতে পারে।

এই রোগের সঙ্গে থাইরয়েড গ্রন্থির লঘুক্রিয়া (hypothyroid), প্রোল্যাকটিন হরমোন বৃদ্ধি, রক্তে শর্করা বৃদ্ধি ও স্নেহজাতীয় পদার্থের অস্বাভাবিকতা (diabetes mellitus ও dyslipidaemia) লক্ষ্য করা গেছে। তাই বেশিদিন এই রোগে ভুগলে রক্তচাপ বৃদ্ধি ও সেকারণে হৃৎপিন্ডের ধমনীর অসুখ হতে পারে।

সাধারণত শারীরিক পরীক্ষাতেই ডাক্তাররা এই রোগটি আঁচ করতে পারেন। এছাড়া তলপেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ডিম্বাশয়ের প্রকৃতি জানতে সাহায্য করে। রক্তে FSH/LH (দুটিই পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নির্গত হরমোন)-এর অনুপাতের তারতম্য (১:২ থেকে ২:১) থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই অসুখের চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হল শরীরে পুরুষ যৌন হরমোনের (testosterone) মাত্রা কমানো ও ডিম্বনিঃসরণ (ovulation) ঘটিয়ে প্রজনন ক্ষমতার উন্নতি ঘটানো।

কয়েকটি উপায়ে এই লক্ষ্য সাধন করা যেতে পারে-

১. **মূল চিকিৎসা হচ্ছে শরীরের ওজন কমানো।** দেখা গেছে শরীরের ওজন শতকরা ১০ ভাগ কমাতে পারলেই এই রোগ-উপশমের সবকটি অভীষ্ট সাধন করা যেতে পারে। খাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ খুব জরুরি। কম ক্যালোরির খাবার খাওয়া (সারাদিনে ১০০০ থেকে ১৫০০ ক্যালোরি), সাধারণত যেগুলিকে 'ফাস্ট ফুড' বলা হয় সেগুলিকে পরিত্যাগ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ রোল, নুডুলস, আইসক্রীম,সফট ড্রিঙ্কস, চকোলেট বা বাজার চলতি তথাকথিত হেলথ ড্রিঙ্কস- এসব একেবারেই চলবে না। ওজন কমানোর জন্য কিছু শারীরিক ব্যায়ামও করা প্রয়োজন। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে হাঁটা। দিনে কমপক্ষে ২ কিমি ২০ মিনিটে হাঁটা খুবই জরুরি যা স্থূলতা কমাতে যথেষ্টই সাহায্য করবে। এই স্থূলতা কমানোকে গুরুত্ব না দিয়ে- এই অসুখের চিকিৎসা করানোর কথা অনেকেই ভাবেন। আর বিশেষ করে কম বয়সি মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ভাবনা খুব কাজ করে। কিন্তু সফলতা না এসে অসুখ আরও গুরুতর হয়ে ওঠে।

২. **হরমোনের** বড়ি যা অনেক সময় গর্ভনিরোধক বড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়- সেগুলির ব্যবহার রক্তে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। এই বড়ি নির্বাচন করার সময় দেখতে হবে যাতে ইস্ট্রোজেনের ভাগ ৩০ থেকে ৩৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি না হয়। আর এইসব ওষুধগুলিতে এমন প্রজেস্টিন জাতীয় যৌগ থাকা বাঞ্ছনীয় যাদের পুরুষ যৌন হরমোন জনিত প্রভাব খুবই কম।

- **পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম একটি হরমোন ঘটিত ব্যাধি**
- **স্থূলতা, ফাস্ট ফুড, ও শারীরিক ব্যায়ামের অভাব— এসবের ফলে পি সি ও এস প্রকাশ পায়**
- **অনিয়মিত ঋতুচক্র, বন্ধ্যাত্ব, মুখে বড় লোম হওয়া পি সি ও এস-এর বিভিন্ন লক্ষণ**
- **চিকিৎসার প্রথম ও প্রধান কথা হল দৈহিক স্থূলতা হ্রাস**

৩. **মেটফরমিন** (metformin)- জাতীয় ওষুধ যা সাধারণত মধুমেহ বা ডায়াবিটিস (টাইপ-২)-এ ব্যবহার করা হয়— সেটিও এই অসুখে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারের ফলে ইনসুলিন হরমোন শরীরে অনেক বেশি ভালোভাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে রক্তে ইনসুলিনের মাত্রাও কমে যায় এবং ডিম্বনিঃসরণের (ovulation) সম্ভাবনা অনেকটা বাড়ে। এই শ্রেণির আরও কয়েকটি ওষুধ আছে যা এই অসুখে একক ভাবে বা অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। মেটফরমিন ব্যবহারের ফলে শরীরে স্বাভাবিক শর্করার মাত্রা খুব কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে পেটের সমস্যা যেমন - বমি, বদহজম বা পেট ব্যথা হতে পারে। এই ওষুধ খাবার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

৪. ক্লোমিফেন সাইট্রেট (clomiphene citrate) নামক ওষুধ স্ত্রীবন্ধ্যাত্ব নিরাময়ে যুগান্তকারী চিকিৎসা হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে গত ৪০ বছর ধরে। এই অসুখে ডিম্বনিঃসরণ না হওয়ার কারণে যে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়— তার চিকিৎসায় ক্লোসিফেন ব্যবহারে সাফল্যের হার খুবই আশাব্যঞ্জক। এছাড়া অনেক সময়ে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ডিম্বাশয় উদ্দীপক ইঞ্জেকশনও (gonadotraphins) দেওয়া হয়ে থাকে।

৫. Laparoscopic ovarian drilling বা ল্যাপারোস্কোপের সাহায্যে ডিম্বাশয় ছেঁদা করা: যখন বারবার ওষুধ প্রয়োগেও ডিম্বনিঃসরণ হয় না তখন এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। তবে ৯০-এর দশকে এই পদ্ধতির ওপর ডাক্তারদের যতটা ভরসা ছিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্যে এখন তাতে ততটা ভরসা বা উৎসাহ নেই।

৬. এই অসুখে শরীরে অস্বাভাবিক লোমের (hirsutism) জন্য spironolactone বা flutamide গোত্রের ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পলিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম যদিও একটি হরমোন জনিত ব্যাধি, কিন্তু এটি একটি জীবনশৈলী জনিত (lifestyle disease) অসুখও বটে। আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাব যেমন- ছোটবেলা থেকেই শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়া, বাড়ির খাবার না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের 'চটজলদি' খাবার (fast food), বাজার চলতি বিজ্ঞাপনের গুনে বহুল প্রচলিত তথাকথিত স্বাস্থ্য পানীয় (health drinks) এই রোগের অন্যতম কারণ বলে ভাবা হয়। পশ্চিমের দেশে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত ধূমপান ও মদ্যপান। পরিবেশের অবনতি- বিশেষ করে কুফল প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নিয়ে পলিমার যৌগের কারখানার ছড়াছড়ি, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে

গর্ভাবস্থায় স্টেরয়েড হরমোনের ব্যবহার, কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই রোগের বাড়বাড়ন্তের জন্য কতখানি দায়ী— তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে।

বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ওষুধের ব্যবহার দ্বারা ডিম্বনিঃসরণ ঘটিয়ে গর্ভসঞ্চার ঘটিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন কিশোরী বা অবিবাহিতা যুবতীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। সে ক্ষেত্রে এইসব ওষুধ যেহেতু তাদের দেওয়া নিরর্থক তাই তাদের চিকিৎসা ওজন কমানো ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের গুরুত্ব খুব বেশি। কিশোরী মেয়ের মাসিক বন্ধ হয়ে থাকা বা অনিয়মিত হতে থাকায় বাবা-মায়েরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ও অনেক সময় একধরনের চিকিৎসক তাতে ইন্ধন জোগান। অসুখটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা তাই জরুরি। এ

রোগের চিকিৎসায় কোনো ওষুধই টানা ২-৩ বছরের বেশি দেওয়া সাধারণত যুক্তিযুক্ত নয়। তাই শরীরের ওজন কম রাখা বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার কথা বারবার বলা দরকার। যদি নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা থাকে তার লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসাও করা যেতে পারে। রোগী ও তার পরিবারকে এটাও বলে দেওয়া দরকার যে এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা সম্ভব একমাত্র ডিম্বনিঃসরণকারী ওষুধের প্রয়োগ করে গর্ভধারণ করে- এবং এটা সম্ভব একমাত্র বিবাহের পরে।

কিন্তু মূল সমস্যা থেকেই যায়। যেহেতু এই অসুখটি থেকে আরও অন্যান্য অসুখ যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ বা হৃৎপিন্ডের অসুখ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে, সেই জন্য এই অসুখের চিকিৎসা কি সন্তান ধারণের পরেও চালিয়ে যাওয়া উচিত? সেটা হলে কতদিন ধরে এবং কোন ওষুধের সাহায্যে? এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের উন্মুখ দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের গবেষণার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, এম বি বি এস, এম ডি ও প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ। বহুদিন মফস্বলে ও কলকাতায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত ও প্রাইভেট প্রাকটিস করছেন। যুক্তিসঙ্গত ওষুধ ব্যবহারের আন্দোলনের একজন অগ্রণী কর্মি এবং 'ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম'-এর সম্পাদক।

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয় এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

উৎস মানুষ
বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপণ- এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুকস্টোর, বিধাননগর পৌরসভা— এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

advt.

QUALITY is the way of life

PALSONS DRUGS

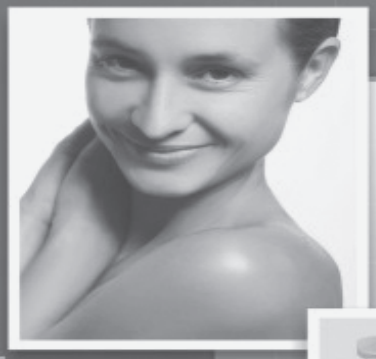

WHO-GMP
Certified Company

NABCB QMS 009
ISO 9001:2008
Certified Company

IDMA
Quality Excellence
Award Winner

PALSONS DRUGS International Tie-ups
For Indian Market

Belgium AURIGA
France BIODERMA
Spain Aesthetic Dermal
Spain SKIN TECH

PALSONS DRUGS PVT. LTD.
10/D/1, Ho-Chi-Minh Sarani
Kolkata - 700 071
Phone : 91-33-2282-3776/4277/4278
E-Mail : brandinfo@palsonsdrugs.com

www.palsonsdrugs.com

PALSONS DRUGS

ব্রণ নিয়ে দুর্ভাবনা!

ব্রণ বোধকরি সবচেয়ে পরিচিত এবং সবচেয়ে সহজপ্রাপ্ত ত্বকের অসুখ। মুখের ব্রণ আর সেই ব্রণ থেকে হওয়া দাগ নিয়ে যাঁরা বিব্রত হচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

ব্রণ সম্পর্কে লিখতে বসেই মনে পড়ছে গত সপ্তাহের কয়েকজন রোগীর কাঁদো কাঁদো মুখের কথা। তারমধ্যে প্রথম তিনজনের কথাই বলি।

প্রথম রোগী বিবাহিত মহিলা। গৃহবধূ, ২৬ বছর বয়স- 'সামনের সপ্তাহে ভাইয়ের বিয়ে আর মুখের কি অবস্থা দেখুন! দু'মাস ধরে বিউটি পার্লারে চিকিৎসা করাচ্ছি— কোনো লাভ হচ্ছে না। এইরকম মুখভর্ত্তি ব্রণ নিয়ে কি মেক আপ করব- অনুষ্ঠান বাড়িতে যেতেই লজ্জা করছে।'

দ্বিতীয় জন পুরুষ। ১৯ বছর, কলেজ পড়ুয়া। 'ব্রণ-র জন্য বন্ধুরা সবাই টিজ করছে। মেয়েরা তো আমাকে এড়িয়েই চলছে। আয়নায় নিজের মুখটা দেখলে মনে হয় এর থেকে আত্মহত্যা করাই বোধহয় ভালো!'

তৃতীয় জন মহিলা। ২৮ বছর বয়স। কর্পোরেট অফিসে চাকুরিরতা - 'একমাস ছুটিই নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে ব্রণটা সারিয়ে দিন। ব্রণ-র জন্য সবসময় এত ডিসটার্বড থাকছি যে কাজে মন দিতে পারছি না। জরুরি মিটিংয়ের সময়ও বার বার ব্রণতে হাত চলে যাচ্ছে।'

ব্রণ নিয়ে এই অনুভূতিগুলো একটুও অতিরঞ্জিত নয়। শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের কম বয়সে ব্রণ দেখা যায়। ব্যথা, অল্প চুলকানি, ফুসকুড়ি, ও সংক্রমণ জনিত নানারকম উপসর্গ ছাড়াও ব্রণতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা মানসিক। কারণ ব্রণ সবচেয়ে বেশি হয় মুখে আর সৌন্দর্যের আয়না তো মুখই। মুখ ছাড়াও বুকে ও পিঠে ব্রণ হয়।

ব্রণ ব্যাপারটা কি?

ব্রণ বা ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে acne vulgaris— এক কথায় ত্বকের কেশ-সিবেসিয়াস এককের প্রদাহ। কি কারণে এবং কিভাবে ব্রণ হয় ব্যাপারটা বুঝতে গেলে লোমকূপের গঠনগত ব্যাপারটা একটু জানতে হবে। লোমকূপের ভেতরে প্রতিটি লোমের পাশে সিবেসিয়াস গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিতে সিবাম নামক তৈলাক্ত একরকম পদার্থ প্রস্তুত হয়। সিবেসিয়াস গ্রন্থির নালী দিয়ে সিবাম নিঃসৃত হয়ে অল্প অল্প করে লোম কূপ দিয়ে বেরিয়ে এসে ত্বকের উপর ছড়িয়ে পড়ে। বয়ঃসন্ধিকালে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে সিবাম একটু বেশি তৈরি হয়। এজন্য ব্রণ দেখা দিতে শুরু করে ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে। কারো কারো ২৫ বছর বয়সের পরও ব্রণ হয়। ব্রণ হওয়ার সময় লোমকূপের মুখে ত্বকের উপরিভাগের কেরাটিন স্তর পুরু হয়ে গিয়ে সিবেসিয়াস নালীর মুখ বন্ধ করে দেয়, ফলে সিবাম বেরোতে না পেরে জমে থাকে। ত্বকে আবার *Propionibaterium acnes* নামে একরকমের জীবাণু বাস করে। পুরু হওয়া কেরাটিন স্তর দ্বারা লোমকূপ বন্ধ হওয়া, জমে থাকা সিবাম আর এই জীবাণু- সব মিলে ত্বকে ব্রণ-র অনুকূল একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় অর ত্বকের সিবেসিয়াম গ্রন্থিবহুল অঞ্চলগুলির লোমকূপের প্রদাহ শুরু হয়-যার ফল হল ব্রণ। কখনো কখনো অন্য জীবাণু সংক্রমণের ফলে বেশি পেকে তা ফোঁড়ার আকারও নেয়। ব্রণর ব্যাপারে 'ব্ল্যাক হেড', ' হোয়াইট হেড' কথাদুটো লোকের মুখে মুখে খুব প্রচলিত। ব্রণর মুখটা খোলা থাকলে তাকে কৃষ্ণমুখ ব্রণ বা ব্ল্যাকহেড বলে। আর বন্ধ থাকলে তাকে সাদামুখ ব্রণ বা হোয়াইট হেড বলে।

বয়ঃসন্ধিকালে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন প্রভাবিত ব্রণ ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ব্রণর জন্য দায়ী।

যেমন ঃ

- অনেক সময় কসমেটিকসের প্রভাবে ব্রণ হয়।
- কোনো কারণে স্টেরয়েড জাতীয় মলম লাগালে সেই অঞ্চলের ত্বকে ব্রণ হয়। না জেনে ত্বক মসৃণ করার ওষুধ ভেবে একটি বিশেষ নামের স্টেরয়েড মলম লাগানোর প্রচলন আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করি। কোনো ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই মানুষ শুধু সচেতনতার অভাবে এই মলম কিনে লাগান— স্টেরয়েড মলমের গুণে সাময়িক প্রথম কিছুদিন মুখের ত্বক একটু চকচকে হয়- তারপরেই শুরু হয় স্টেরয়েড মলমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া— মুখভর্তি দীর্ঘস্থায়ী মারাত্মক ব্রণ! মানুষের এব্যাপারে সচেতন হতে হবে যে ওষুধ তালিকাভুক্ত কোনো মলমকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দৈনন্দিন সাজের জিনিসের ঝুড়িতে রাখা চলবে না।

গর্ভাবস্থায় ভিটামিন-এ জাত আইসোটেট্রিনয়েন গোত্রের ওষুধ একেবারে নিষিদ্ধ

● মুখের কোনো অঞ্চলের উপর দীর্ঘ সময় ধরে চাপ পড়েও লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন যারা খুব টাইট হেলমেট পরেন তাদের অনেক সময় শুধু কপালে ব্রণ দেখা যায়।

● পেশাগত কারণে যাদের দীর্ঘক্ষণ তৈলাক্ত পরিবেশে থাকতে হয় তাদের শুধু মুখে নয়, শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও ব্রণ হতে পারে।

● কিছু কিছু গুরুতর অসুখ আছে যার চিকিৎসার জন্য রোগীকে দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেতেই হয়— এসব ক্ষেত্রেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্রণ দেখা যায়। এছাড়া যক্ষ্মারোগের ওষুধ আইসোনিয়াজাইড-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ব্রণ হতে পারে।

খাবার বিশেষ করে বেশি তেল, ঘি জাতীয় খাবারের সঙ্গে ব্রণর সম্পর্ক নিয়ে নানারকম ভুল ধারণা চিরদিনই চলে আসছে। প্রয়োজনের বেশি তৈলাক্ত খাবার কখনোই শরীরের জন্য ভালো নয়- কিন্তু ব্রণর সঙ্গে তৈলাক্ত খাবারের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।

২০ বছর বয়সের পর থেকে নতুন ব্রণ বেরোনো এমনিতেই অনেকটা কমে যায়। কিন্তু ব্রণের চিকিৎসা প্রয়োজন তখনও এই কারণে যে শরীরের ঢাকা জায়গায় বড় খুব ব্যথাযুক্ত ফোঁড়া হলেও মানুষ যতটা না ঘাবড়ায়, মুখে ব্রণ বেরোলে তার চাইতে অনেক বেশি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময়ে দিশাহারা হয়ে বিজ্ঞাপন দেখে নানাকরম অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দিকে ছোটে- ফল হয় উল্টো! আর ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা না হলে মুখে ব্রণর স্থায়ী ক্ষত তৈরি হয়ে যায়।

ব্রণর চিকিৎসার প্রাথমিক লক্ষ্য-লোমকূপের বন্ধ মুখটা যাতে খুলে যায়- সিবাম যাতে ঠিকমতো নিঃসৃত হতে পারে। আর সংক্রমণ থাকলে জীবাণুনাশক ওষুধ খাওয়া বা লাগানো। ব্রণ থাকলে সাবানের বদলে ক্ষারহীন মুখ পরিষ্কার করার লোশন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করাই ভালো। কারণ সাধারণ সাবান বেশি ক্ষারীয় (সাবানের pH বেশি) এবং দেখা গেছে ক্ষারীয় মাধ্যমে *Propionibactrium acne* জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে যায়। আ অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত সাবানে মুখের চামড়া খসখসে হয়ে গিয়ে জ্বালা করে।

মৃদু ধরণের ব্রণের চিকিৎসাঃ ১. ট্রেটিনয়েন (ভিটামিন এ) বা অ্যাডাপেলিন (ভিটামিন এ-র কাছাকাছি গঠনের লাগানোর ওষুধ) ইত্যাদি — এই ধরণের ওষুধের কাজ কেরাটিন সরিয়ে ব্রণর মুখ খুলে দেওয়া। ২. ক্লিন্ডামাইসিন, এরিথ্রোমাইসিন, বা বেঞ্জাইল পারক্সাইড জাতীয় জীবাণুনাশক মলম লাগানো। ব্রণর অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী এই দু'ধরণের মলম আলাদাভাবে বা একসঙ্গেও ব্যবহার করা যায়। ২

থেকে ৫ মাস চিকিৎসার পর ফল দেখা যায়। এইসব লাগানোর ওষুধে বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই ব্যবহার করবেন।

- বয়সন্ধির সময় থেকে ত্বকের তৈলগ্রন্থির ওপর অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে ব্রণ হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা
- এছাড়াও কসমেটিকস, বিভিন্ন লাগানোর বা খাবার ওষুধ, খনিজ তৈলর সংস্পর্শ, চাপা পোশাক ইত্যাদি থেকে ব্রণ হতে পারে
- ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করলে সাধারণ ব্রণ খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ওষুধ বহুদিন ব্যবহার করতে হয়
- ব্রণর দাগের চিকিৎসায় ডার্মাটো সার্জারি অনেকটা কার্যকর

মাঝারি ধরনের ব্রণতে লাগানোর মলমের সঙ্গে টেট্রাসাইক্লিন গোত্রের বা ম্যাক্রোলাইড গোত্রের জীবাণুনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। প্রতিটি অ্যান্টিবায়োটিকেরই নিজস্ব কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে জীবাণুরাও প্রতিরোধী হয়ে যায়। সুতরাং শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শেই অ্যান্টিবায়োটিক খেতে অথবা লাগাতে হবে।

মারাত্মক ধরণের ব্রণতে মুখে অনেক সংখ্যায় পুঁজভর্তি থলিযুক্ত গন্ড (nodulocystic acne) দেখা যায়। শুধু লাগানোর ওষুধে এক্ষেত্রে বিশেষ ফল হয় না। উপরে উল্লিখিত লাগানোর ওষুধের সঙ্গে 'আইসোট্রেটিনয়েন নামক একধরনের 'ভিটামিন এ জাত' যৌগ খেলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এই যৌগ কাজ করে প্রধানত ব্রণর মুখের কেরাটিনের ঢাকনা সরিয়ে দিয়ে সিবাম নিঃসরণের পথ খুলে দিতে। কিন্তু বিশেষ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে এই ওষুধ দিতে হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর ক্ষতিকারক প্রভাবের ফলে গর্ভধারণকালে আইসোটেট্রিনয়েন জাতীয় ভিটামিন এ জাত যৌগ ওষুধ একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি এই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করার তিন মাসের মধ্যে গর্ভবতী হওয়া চলবে না। এই সতর্কীকরণের ব্যাপারে রোগিনীকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে তবেই আইসোট্রেটিনয়েন দেওয়া উচিৎ। যকৃতের সমস্যা ও রক্তে লিপিড মাত্রা বেশি থাকলেও এই ওষুধ খাওয়া চলবে না। টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক যা ব্রণর চিকিৎসায় হামেশাই ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গেও আইসোট্রেটিনয়েন খাওয়া নিষেধ। কারণ উভয়েরই একই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। উভয়েই সাময়িকভাবে অন্তঃকরোটি মস্তিষ্কের চাপ বাড়িয়ে দেয়। এ ওষুধ কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খাবেন না। চিকিৎসক একবার লিখলে বারবার ব্যবহারও খুব মারাত্মক হতে পারে।

যেহেতু অ্যান্ডোজেন হরমোন ব্রণর জন্য অনেকটা দায়ী, তাই কিছু সমস্যা, যেমন মহিলাদের পলিস্টিক ওভারি সিনড্রোম— এইসব ক্ষেত্রে প্রচলিত চিকিৎসা অনেক সময়ই কাজ করে না। তখন অ্যান্টিঅ্যান্ড্রোজেন ওষুধ এবং ইস্ট্রোজেন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হতে পারে। তবে সবসময়ই রোগের ভয়াবহতা, রোগীর বয়স, পেশা, উপার্জন, মানসিক অবস্থা সবদিক বিচার করে কোনো ব্রণর রোগীকে কখন কোন চিকিৎসা দিতে হবে ডাক্তারই তার শ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক।

ব্রণর চিকিৎসায় সার্জারির ভূমিকাঃ কিছুদিন আগেও মুখবন্ধ কেরাটিনযুক্ত ব্রণগুলোকে একটা

ছোট্ট বিশেষ শলাকা জাতীয় যন্ত্র দিয়ে চাপ দিয়ে ভেতরের ঘন সাদা পদার্থটা বের করে দেওয়া হত। এরফলে ব্রণর নিরাময় কিছুটা ত্বরান্বিত হত। কিন্তু আইসোট্রেটিনয়েন ওষুধটি আবিষ্কারের পরে এই ধরনের খোঁচাখুঁচির প্রয়োজন কমে গেছে। যেসব রোগী বা রোগিনীকে আইসোটেট্রিয়েন ওষুধটি খাওয়ানো যাবে না তাদের এখনো প্রয়োজন মতো এই চিকিৎসা করা হয়।

মারাত্মক ধরনের ব্রণতে কম-বেশি ক্ষত চিকিৎসার পরও থেকে যায়। এই ক্ষত নিরাময়ের জন্যই এখন সার্জারির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতের গভীরতা ও তীব্রতা অনুযায়ী ডার্মঅ্যাব্রেশন এবং লেসার সার্জারি করা হয়। এছাড়াও ব্রণর ক্ষত সারানো বা কমানোর জন্য ক্ষেত্রবিশেষে আরও কয়েক ধরনের সার্জারি করার দরকার হতে পারে। অনেক সময় দু'একবারের বেশিও সার্জারি করতে হয়। এইসব পদ্ধতিতে সোজা কথায় ক্ষতযুক্ত এবড়ো খেবড়ো চামড়ার উপরিস্তর তুলে দিয়ে সেই জায়গার চামড়াকে সমতল আকারে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। অনেকসময় এর প্রভাবে সেই জায়গার চামড়ার রঙ অপেক্ষাকৃত গাঢ় বা হাল্কা হয়ে যেতে পারে আবার নতুন ক্ষতের সৃষ্টিও হতে পারে। তবু এই ধরনের নতুন চিকিৎসা মুখের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্রমশঃই একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। তবে এইসব চিকিৎসার খরচ এখনো অনেকটাই বেশি। লেসার সার্জারি বা ডার্মঅ্যাব্রেশনের আগে ডাক্তার এবং রোগীর উভয়েরই কর্তব্য খোলাখুলি খরচ এবং অন্য লাভ-ক্ষতির হিসাবের পাল্লাটা বুঝিয়ে দেওয়া এবং বুঝে নেওয়া।

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এম বি বি এস, ডি ভি ডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক,

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১২ সংখ্যায় ''এক অন্যধারার মানুষ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়'' শিরোনামে স্মৃতিচারণ প্রকাশ করে আপনারা পশ্চিমবাংলার গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এক পুরোধার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আগের দুটি সংখ্যাতেও যথাক্রমে বিজন ষড়ঙ্গী ও ডা. সুজিত কুমার দাসের প্রতি একইভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। প্রয়াসটি প্রশংসনীয়।

এবারের সংখ্যায় স্মৃতিচারণ করেছেন পবন মুখোপাধ্যায় যাঁর সঙ্গে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''আলাপ-সহযাত্রা দীর্ঘ কুড়ি বছরের বেশি...'' সালের হিসেবে ১৯৮০-২০০০। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ সময়ের ঠিক পরেই দুজনার সহযাত্রায় ছেদ পড়ে। কেন ছেদ, কিসের জন্য বিচ্ছেদ তা এ চিঠির আলোচ্য বিষয় নয়।

পবনবাবু তাঁর স্মৃতিচারণায় টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপোষহীন মনোভাবের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে-দুজনের সম্পর্কের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। 'মানুষ' পত্রিকার জন্মবৃত্তান্তর বর্ণনা দিতে গিয়ে পবনবাবু বিড়লা মিউজিয়ামে কর্মরত দু'চারজন সহকর্মীর কথা উল্লেখ করেছেন। পবনবাবুর কথায় '' এঁদের সাহায্য না পেলে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষ' পত্রিকা গড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত...'', তাই কি? অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জেদি মানুষের ক্ষেত্রে এটি যে একটি ছেঁদো যুক্তি তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। বরং এমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পবনবাবু নিজের অপরিহার্যতা বোঝাতে এধরনের যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। স্মৃতিচারণটি এককথায় অসম্পূর্ণ ও দায়সারা গোছের, যা হালকাচালে লেখা হয়েছে। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎস মানুষ-কে কেন্দ্র করে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাতে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল তা আজ ইতিহাস। পবনবাবুও ঐ কর্মকান্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত/জড়িয়ে ছিলেন। অথচ স্মৃতিচারণে সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন না। ওনার দেওয়া তথ্য গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামগ্রিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য দলিল হতে পারত। পবনবাবু সেদিকটায় একেবারেই নজর না দিয়ে আরেকটি ভালো কাজে যুক্ত হবার সুযোগ হাতছাড়া করলেন। উল্টে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার উল্লেখ করতে গিয়ে কিছু আলটপকা মন্তব্য করে বসলেন। স্মৃতিচারণার সেইসব মন্তব্য বিশেষ করে শেষ তিনটি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মন্তব্য গণবিজ্ঞান আন্দোলনে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে এতটুকুও খর্ব করবে না বরং একটা ভুল সংকেত চলে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এধরনের মন্তব্য করার ঝোঁকটি বড়ই মারাত্মক। ব্যক্তির কাজের থেকে তাঁর ছিদ্রান্বেষণের প্রক্রিয়ায় অনেকেই এভাবে বুঝে বা না বুঝে জড়িয়ে যান। এধরনের স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হতে থাকলে পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার আশংকা থেকেই যাবে। যা বড়ই বিপজ্জনক। সম্পাদককে সেদিকটায় নজর দিতে অনুরোধ জানাই।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাসহ
বরুণ ভট্টাচার্য
৩৮- ডি, প্রসন্ন নস্কর লেন
কলকাতা- ৭০০০৩৯

সম্পাদকের উত্তরঃ ভালো মন্দ মিলিয়েই মানুষ, কেউই তার ব্যতিক্রম নন। ডা. সুজিত কুমার দাস ও বিজন ষড়ঙ্গীকে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সঙ্গে পবন মুখোপাধ্যায়ের পার্থক্য আছে। ডা. পুণ্যব্রত গুণ বা ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য ব্যক্তিদের দেখেছেন অনেকটা দূর থেকে, পক্ষান্তরে পবন মুখোপাধ্যায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন দুই দশক। তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত বোঝাপড়া থাকাটাই স্বাভাবিক। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা হিসাবেই জানি। তাঁর সম্বন্ধে সামান্য সমালোচনামূলক মন্তব্য তাঁকে হেয় করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই নয়।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে তাঁর অন্যান্য সহযোগীরা ভবিষ্যতে 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকায় লিখতেই পারেন।

ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগ বাড়ছে

আমাদের কারাগারগুলিতে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং এইডস -এই তিনটি সংক্রামক রোগ বেড়ে চলেছে। এরা, বিশেষ করে যক্ষ্মা রোগ, জটিল জনস্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কারাগার তথা সংশোধনাগারে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগ ঠেকাতে না পারলে বিপদ গোটা সমাজের— লিখছেন **ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়**।

নানা কারণে আমাদের সমাজে ওষুধ-প্রতিরোধী (drug-resistant) যক্ষ্মা রোগীদের সংখ্যা বাড়ছে। এর কিছু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিছুটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এমন একটি সমস্যার কথাই এখানে আলোচনা করছি। কেননা চিকিৎসক মাত্রই জানেন ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগী কি জটিল, কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে। যে তিনটি সংক্রামক রোগ আমাদের জাতীয় জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে প্রথম সারি অধিকার করে রয়েছে এরা হল যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং এইচ.আই.ভি./ এইডস। বলার কথা হল আমাদের কারাগারগুলিতে এই তিনটি সংক্রামক রোগই বেড়ে চলেছে এবং জটিল ও কঠিন জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করছে। বিশেষত ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষা রোগীদের ক্ষেত্রে একথা বলা যায়। যেভাবে এই সংখ্যা বাড়ছে, তা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার।

জেলখানা বা কারাগারকে এখন বলা হচ্ছে সংশোধনাগার; কিন্তু শুধু নামেই এর পরিবর্তন হয়েছে, ভেতরের জেলখানাটা প্রায় একই আছে। এখানে দুই ধরনের বন্দি আবাসিক থাকে— হাজতি আর মেয়াদি। হাজতি তাদেরই বলা হয় যাদের বিচার চলছে, অর্থাৎ যারা বিচারাধীন এবং মেয়াদি হল সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা। আমাদের জেলখানায় হাজতিদের সংখ্যা বেশি— প্রায় আশি শতাংশ এবং এদের নব্বই শতাংশ অত্যন্ত গরিব শ্রেণির মানুষ। কারাগার হল এদের 'জুডিসিয়ল কাস্টডি' অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র বিচারকের আদেশে কাউকে আটকে রাখা হয়। যাইহোক, বন্দিদের যক্ষ্মা রোগ বেশি হয় কারণ এখানে নেশাসক্ত মানুষও অনেক বেশি থাকে এবং এখানকার হাজতিরা এই রোগ ছড়ায়। কয়েক দিন বা কয়েক মাস অতিথি হিসাবে এখানে বাস করে এরা জেলে এই রোগ দিয়ে যায়।

এখন জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ কর্মসূচি বদলে হয়েছে RNTCP (Revised National Tuberculosis Programme) যাতে কোনো ব্যক্তির যক্ষ্মা রোগ হয়েছে এমন সন্দেহ হলে শুধুমাত্র কফ পরীক্ষা করা হয় এবং কফে যক্ষ্মার জীবাণু পেলে তবেই তাকে যক্ষ্মার ওষুধ দেওয়া হয়। একে তাঁরা বলেন ডটস (Directly Observed Treatment With Short Course Chemotherapy) কর্মসূচি। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কফ ছাড়া বাকি যে দেহরসে যক্ষ্মার জীবাণু বাসা বাঁধে এদের পরীক্ষা করা হবে কি করে? এর চিকিৎসাই বা কি করে হবে? এর উত্তর হল যক্ষ্মা প্রধানত ফুসফুসে বাসা বাঁধে অর্থাৎ লিমফ গ্রন্থি, বৃক্ক, অন্ত্র ইত্যাদি দেহকোষে যক্ষ্মা হলেও তা অনেক কম হয়, তাই এসব ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। এই কারণে ফুসফুসের যক্ষ্মা যেহেতু কফ থেকে জানা সম্ভব তাই একমাত্র কফকেই রোগ নির্ণয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা বলা হচ্ছে যক্ষ্মার চিকিৎসা যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী তাই অন্য কোনো ক্ষেত্র (যেমন বুকের ছবি) থেকে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় করে ওষুধ খাওয়া শুরু করলে চিকিৎসা অনিয়মিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তুলনায় যাদের কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গেল তাদের নিশ্চিত ভাবে চিকিৎসা করলে এই রোগ ছড়িয়ে পড়া এবং ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কমানো যাবে।

কিন্তু কারাগারে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কারাগারে যদি চিকিৎসকদের সন্দেহ হয় কোনো বন্দির যক্ষ্মা হয়েছে, তাহলে তাঁরা কাছাকাছি জেলা হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজে বন্দিকে পাঠান। সেখানে তারা এ বিভাগ থেকে ও বিভাগে ঘুরে বেড়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা পায় না। তুলনায় যারা ডটস চিকিৎসা পায় তাদের অধিকাংশের চিকিৎসা অনিয়মিত হয়। কারণ এই হাজতিরা হয়তো এক দু' মাস কারাগারে চিকিৎসা করে খালাস বা জামিন পায় এবং বাড়ি চলে যায়। তাদের কর্তব্য হল বাড়ি ফিরে কাছাকাছি ডটস সেন্টারে যোগাযোগ করে আবার ওষুধ চালু করা। সেই মতো কাগজপত্রও হয়তো তাকে দেওয়া হয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে আর ডটস সেন্টারে যায় না। হয়তো কিছুদিন চিকিৎসা করার পর তার অনেক পরিমাণে রোগ উপশম হয়— তখন সে মনে করে আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ফলে তার চিকিৎসা অনিয়মিত হয় এবং তার ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুন বেড়ে যায়। এর ফলে সে নিজে তো মরবেই সেই সঙ্গে তার পরিবারের এবং সমাজের ভয়ংকর ক্ষতি করবে; কিন্তু এই কথা বোঝার ক্ষমতা তার নেই কারণ সে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ।

এই সমস্যার সমাধান করা যাবে কি করে? যদি সমগ্র রাজ্যব্যাপী যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার একপ্রকার জীবন্ত নেটওয়ার্কিং থাকে। এই নেটওয়ার্ককে কারাগারের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। অর্থাৎ চিকিৎসা চলছে এমন কোনো রোগী খালাস বা জামিন পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা ঐ নেটওয়ার্ক মারফৎ ঐ নির্দিষ্ট ডটস সেন্টারে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তখন ঐ সেন্টারের কাজ হল ঐ ব্যক্তির গ্রামে বা পাড়ায় গিয়ে তাকে খুঁজে বার করে অবিলম্বে আবার চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া। এই বিষয়টি না হওয়ার কারণ নেই। কেননা RNTCP-তে সমস্ত পশ্চিমবাংলাকে ডটস সেন্টার দিয়ে চমৎকার ভাবে ঘিরে ফেলা আছে; কিন্তু তা সর্বদা কার্যকরী ভূমিকা নেয় না। ফলে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে, এ আশংকা করা যায়। আমাদের কাছে গত ছয় মাসে পনের জনের এমন একটি তালিকা রয়েছে। আমরা কিছুতেই এ ব্যাপারে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে পারছি না।

লেখক পরিচিতি : ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এম বি বি এস, ডি পি এম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে আলিপুর কেন্দ্রিয় সংশোধনাগারে মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক।

জীবন যখন শুকায়ে যায়...

আর্তের সেবা— প্যালিয়েটিভ কেয়ার। বিজ্ঞান, মানবিকতা আর সংগঠিত প্রচেষ্টার এই ত্রিবেণী সঙ্গমের হাল-হকিকত জানাচ্ছেন **ডা. সুস্মিতা ঘোষাল**।

সকাল বেলা ফৌজা সিং এর বৌকে ঝোলা হাতে আউটডোরের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে প্রমাদ গনি। গত সপ্তাহে এই কৃষক পরিবারটি বড়ই বিড়ম্বনায় ফেলেছিল আমাকে। ফৌজার খাদ্যনালীর ক্যান্সার সমস্ত চিকিৎসাকে কলা দেখিয়ে রে রে করে বেড়ে চলেছে। অনাহার, অনিদ্রা, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর ফৌজাকে পাঁজাকোলা করে গ্রামের লোকেরা আবার হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, তারা কিছুতেই মানবে না যে এতবড় হাসপাতালের নামী ডাক্তাররা ওকে সারাতে পারবে না। কাশির দমকে ঠিকরে আসা চোখের আকুল আর্তি আমায় নাড়া দেয়। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কখনো রূঢ় হই, কখনো ব্যস্ততার ভান করি, শেষে দায় এড়াতে ওদের পাঠিয়ে দিই 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার' এ ডাক্তার মিনির কাছে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার

- **মৃত্যুকে এগিয়ে আনে না, পিছিয়ে দেয় না**
- **সার্বিকভাবে কষ্টের লাঘব করে**

ফৌজার মতো বহু রোগী দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে ধীরে অথচ অবধারিত ভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। এদের রোগ নির্মূল হবে না, তাই হাসপাতালের ব্যস্ত চিকিৎসক অন্যদের রোগমুক্ত করার চেষ্টা করেন। রোগ না সারলেও এদের কষ্টের লাঘব করা সম্ভব। যে বিশেষ পদ্ধতিতে এই সব রোগী ও তাদের পরিবারবর্গকে শারীরিক ও মানসিক আরাম দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় প্যালিয়েটিভ কেয়ার। ল্যাটিন ভাষায় প্যালিয়েব মানে to cloak— সাধারণ চিকিৎসার সাথে সহানুভূতি-মমতা-সেবার আঁচলে রোগীকে সযত্নে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা। এ কোনো অত্যাধুনিক চিন্তাধারা নয় - সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে আর্তের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে ইতিহাসে। মধ্যযুগের ইউরোপে অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের সেবা শুশ্রূষার জন্য তৈরি হয়েছিল হসপিস। আধুনিক যুগে ইংল্যান্ডে

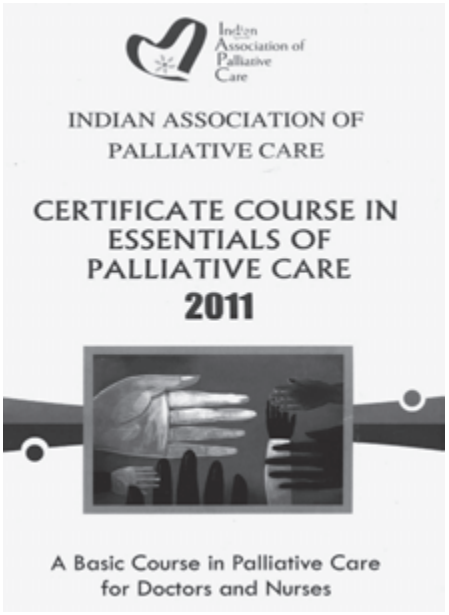

Dame Cecily Saunders চালু করেন St. Christopher's Hospice। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বহু অসাধ্যসাধন করেছে। মৃত্যুর কাছে হার মানতে নারাজ চিকিৎসক তাই যেকোনো মূল্যে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে কঠোরতম প্রয়াস চালিয়ে যান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রয়াস রোগীর শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। জীবনের শেষ সময়টুকু নিজের পরিবেশে, নিজের পরিবারের সান্নিধ্যে না কাটিয়ে অলক্ষ্যে সর্বাঙ্গে নল লাগিয়ে অচৈতন্য অবস্থায় বিদায় নিতে হয়।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার

- **রোগীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করে**
- **রোগী ও তার পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা**

প্যালিয়েটিভ কেয়ার শেখায় কিভাবে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ফল চিকিৎসা বন্ধ করে রোগী ও তার পরিবারের সার্বিক কষ্ট লাঘব করে, সসম্মানে বাকি জীবনটা কাটানো যায়। শুধুমাত্র ক্যান্সার বা AIDS নয়, এই সুযোগ নিয়ে সুফল পান সব রোগী যাদের হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, স্নায়ু বা মস্তিষ্ক পাকাপাকিভাবে কাজে ইস্তফা দিয়েছে।

আমাদের দেশে বছরে আনুমানিক ৭০ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছেন, অনেকেই বড় কষ্ট পেয়ে। অথচ এদের মধ্যে এক শতাংশেরও কম মানুষ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সুযোগ পান। দক্ষিণ ভারতে বিশেষত কেরলে এই চিন্তাধারায় বিস্তর কাজ হচ্ছে- বাকি দেশে মাত্র গুটিকতক শহরে এই সুবিধা রয়েছে। চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষ এখনো এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার ও নার্স এখনো অপ্রতুল। সাম্প্রতিকালে MCI স্নাতকোত্তর স্তরে এই বিষয়টি চালু করার প্রচেষ্টা নিয়েছে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার

- **এক দলগত প্রচেষ্টা**
- **পরশ-প্রধান, সামান্য-প্রযুক্তি বিজ্ঞান**
- **সৎ ও সংবেদনশীল বার্তালাপ নির্ভর**

প্রাথমিক স্তরে কাজের জন্য সমাজসেবক, প্রাথমিক চিকিৎসক ও নার্সদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে লোকবল যথেষ্ট বেড়ে যায়- কেরলের গ্রামগুলি এর জলন্ত উদাহরণ। Indian Association of Palliative Care দেশের বিভিন্ন শহরে Certificate Course পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। কলকাতাতেও সে ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীর অভাব নেই, তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ কেরলের চেয়ে কিছু কম নয়। তাই ইচ্ছা করলে অমাদের রাজ্যেও সুষ্ঠু ও সাবলীল প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিষেবার ব্যবস্থা করা যায়। চিকিৎসক মহলকেও এব্যাপারে সজাগ করা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শুরু থেকেই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মূল সূত্রগুলি প্রয়োগ করলে রোগীর চিকিৎসা আরও ভালোভাবে করা যায়— পরের পাতার রেখাচিত্রটি দেখুন। শুধুমাত্র ব্যথার কারণ ও

তীব্রতা বুঝে উপযুক্ত ওষুধ দিতে পারলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে এই পরিষেবা চালু করা যায়। হাসপাতালে আলাদা আউটডোর থাকলে এই রোগীদের বিশেষভাবে সময় দেওয়া যায়। যে রেগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সম্ভব নয় তাকে বাড়ি গিয়ে দেখে আসা যায়। বাড়িতেও যখন রোগীর সেবা করা কষ্টকর হয় তখন সাময়িকভাবে তাকে হসপিসে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। ভারতের জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরের ক্যান্সার দমন

পরিকল্পনায় প্যালিয়েটিভ কেয়ারের বন্দোবস্ত রাখার উল্লেখ রয়েছে।

'সতশ্রী অকাল!' ফৌজার বৌ আজ খুব খুশী। ফৌজার ব্যথা কমেছে, ঘুম হয়েছে, ফোলা কমেছে। সুজির পায়েস দিয়ে নাস্তা করেছে। হসপিসের নার্স পরিষ্কার ব্যান্ডেজ বেধেঁ দিয়েছে। ফৌজার ছেলে দেশে গিয়ে ফসল কাটতে পেরেছে। আমার জন্য দেশ থেকে মক্কির আটা পাঠিয়েছে। বৌয়ের চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা আমায় আত্মতৃপ্তি দেয়। আর দেয় শিক্ষা - 'আমার কিছু করার নেই' একথা আর কখনো বলব না।

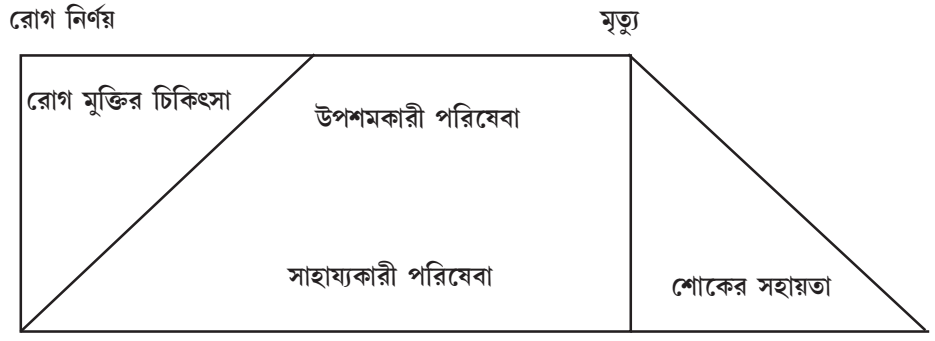

লেখক পরিচিতি : ডা. সুস্মিতা ঘোষাল কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করার পর চন্ডীগড়ে পি জি আই এম ই আর থেকে রেডিওথেরাপিতে এম ডি করেন; বর্তমানে সেখানেই অধ্যাপনায় রত। তাঁর পেশাগত জীবন কাটে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায়, গবেষণায় আর ডাক্তারি ছাত্রদের পড়ানোয়।

advt.

পাভলভ ইনস্টিটিউটের দু'টি পত্রিকা

মানবমন
মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা

Psyche and Society
Six-monthly Journal
Yearly Subscription Rs. 50

পাভলভ ইনস্টিটিউট
৯৮, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলি - ৭০০০০৭
ফোন- ২২৪১ ২৯৩৫
৯৪৭৭২৪২৯৩৯
৯৪৩৩৬৬২৭৭৬

পাভলভ ইনস্টিটিউটের ক'টি বই

ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর
পাভলভ পরিচিতি (দেড়শো টাকা)
শৈশব ও তার সমস্যা (পঞ্চাশ টাকা)
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (দুশো টাকা)

ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়-এর
গ্রামীণ স্বাস্থ্য (চল্লিশ টাকা)
রোগ অসুখ (আশি টাকা)

ভ্যাসেকটমি

ছোট পরিবার সুখী পরিবার। হয়তো অনেকে একথা মানবেন, অনেকে মানবেন না। কিন্তু কয়েকটি সন্তান জন্মে যাবার পরে গর্ভ নিরোধ করার স্থায়ী, নিরাপদ এববং বিনা খরচার পদ্ধতি অনেক দম্পতিই বেছে নিতে চান। আশ্চর্য ব্যাপার তাঁদের অনেকেই স্ত্রীর 'লাইগেশন' অপারেশন করিয়ে নেন, যদিও স্বামীর ভ্যাসেকটমি অপারেশন অনেক সহজ, নিরাপদ ও একই রকম কার্যকর। যে ভয়ে পুরুষ ভ্যাসেকটমি করাতে চান না তা অমূলক— লিখছেন **ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী**।

গাইনিতে ইন্টার্নশিপ চলাকালীন আমাদের অর্থাৎ ইন্টার্নদের অ্যাডমিশন ডে-র পরদিন আমাদের অন্যতম কাজ ছিল লাইগেশনের জন্য কনসেন্ট বা অনুমতিপত্র জোগাড় করা। অর্থাৎ যে মহিলারা দুই বা ততোধিকবার মা হয়েছেন তাঁদের বন্ধ্যাত্বকরণে রাজী করানো। আশ্চর্যের ব্যাপার যে মায়েরা বাচ্চার জন্ম দেওয়ার আগে নিজেরাই লাইগেশন করানোর কথা বলতেন, তাঁদের অনেকেই পরদিন অর্থাৎ বাচ্চার জন্ম দেওয়ার পর বাড়ির লোকের সাথে কথা বলে বেঁকে বসতেন। কারণটা সহজবোধ্য। আমাদের দেশে যেখানে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশি সেখানে পরে যে আরও একটি শিশুর জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, সেকথা অনেকেই মানতে চাইতেন না। তাছাড়া অপারেশনের সময় অ্যানাস্থেসিয়া জনিত মৃত্যু ইত্যাদির ভয়ও তো ছিলই। ততদিনে আমরা জেনে গেছি লাইগেশনের তুলনায় ভ্যাসেকটমি অনেক সহজ, নিরাপদ ও নিশ্চিত জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়। কিছুতেই ভেবে পেতাম না এইসব মায়েরা যাঁদের প্রায় প্রতি বছরই একবার করে মা হতে হয়, তাঁদের স্বামীরা ভ্যাসেকটমি করান না কেন? পরে বুঝেছি এর পিছনে আসল কারণ হল ভ্যাসেকটমি সম্পর্কে অজ্ঞানতা। বিশেষতঃ পৌরুষত্ব হারাবার ভয়। আদৌ কি তা সত্যি? কী করা হয় আসলে ভ্যাসেকটমিতে? আসুন দেখা যাক।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় বেশ কিছু পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদ্ধতিগুলি সুলভ, সহজে ব্যবহারযোগ্য, সুরক্ষিত এবং যথেষ্ট পরিমাণ কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে। মূলগত ভাবে এই পদ্ধতিগুলি দু'ধরনের—

১. সাময়িক (temporary)
২. স্থায়ী (permanent)

সাময়িক পদ্ধতিগুলি হল সেইসব প্রক্রিয়া যেগুলির ব্যবহার ইচ্ছামত বন্ধ করে স্বাভাবিক গর্ভধারণ করা সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থাগুলি মূলত দুটি বাচ্চার মধ্যে ব্যবধান রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্থায়ী পদ্ধতিগুলি মূলত ব্যবহৃত হয় পরিবার সম্পূর্ণ হবার পর।

যেহেতু গর্ভধারণ প্রক্রিয়াটি পুরুষ ও নারী উভয়ের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং জন্মহার হ্রাসের পদ্ধতিগুলিও দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়াটি মূলত লাইগেশন ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ভ্যাসেকটমি।

ভ্যাসেকটমি কী?

এটি পুরুষদের একটি স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়া। ছোট অপারেশন করে শুক্রনালীর অংশবিশেষ বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ারই অন্য নাম ভ্যাসেকটমি।

কাদের ভ্যাসেকটমি করা হয়?

যৌন সঙ্গমে সমর্থ বিবাহিত পুরুষ যাঁরা মনে করেন তাঁদের যথেষ্ট সংখ্যক সন্তান রয়েছে তাঁরাই এই প্রক্রিয়ার জন্য আদর্শ।

কীভাবে করা হয়?

ভ্যাসেকটমি সাধারণত করা হয় স্ক্রোটামে লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে। অর্থাৎ অন্ডথলি ও তার চারপাশ ইঞ্জেকশন দিয়ে অবশ করে। প্রথমে হাত দিয়ে শুক্রনালীর (Vas deferens) অবস্থান বুঝে নেওয়ার পর সেই অংশের চামড়া ও মাংস সামান্য কেটে (আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি) শুক্রনালীটি বের করে আনা হয়। এরপর তার উপর ১ সেমি ব্যবধানে দু'টি বাঁধন দেওয়া হয় এবং মাঝের অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। তারপর আবার শুক্রনালী যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে চামড়া ও পেশি সেলাই করে দেওয়া হয়। একই ভাবে অন্যদিকের শুক্রনালীটিও কেটে সেলাই করা হয়। পুরো পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে আধ ঘন্টারও কম। আর

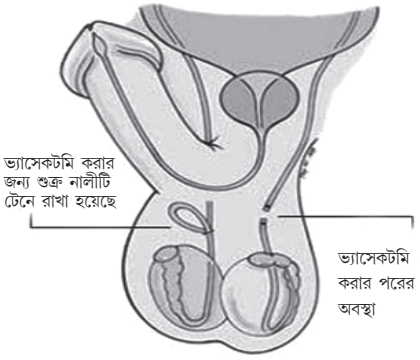

অপারেশনের এক ঘন্টা পরই রোগীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সকালের চা-জলখাবার খেয়ে ভ্যাসেকটমি করিয়ে এসে আপনি বাড়িতে দুপুরের ভাত খেতে পারবেন।

মনে রাখবেন

ভ্যাসেকটমি করার সঙ্গে সঙ্গেই একজন পুরুষ নির্বীজ (Sterile) হয়ে যান না। কারণ শুক্রনালীর শেষাংশে প্রায় ২-৩ মাস বীর্য জমা থাকতে পারে এবং এই বীর্য (যাতে শুক্রাণু থাকে) নিঃশেষিত হতে প্রায় কুড়ি বার বীর্য নিষ্ক্রমণের প্রয়োজন হয়। এরপর থেকে নির্গত বীর্য হয় শুক্রাণুহীন অর্থাৎ প্রজননে অক্ষম। তাই ভ্যাসেকটমি হওয়ার একমাস বাদে একবার এবং তারপর থেকে প্রতি মাসে একবার করে বীর্য পরীক্ষা করা উচিৎ। পরপর দুটি বীর্যের নমুনা শুক্রাণুহীন হলে তবেই একজন পুরুষকে নির্বীজ বলা যেতে পারে।

এতবার বীর্য পরীক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না, তাই সবাইকেই সাধারণভাবে বলা হয় যে অপারেশনের ৩ মাস পরে পর্যন্ত অন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া (যথা কন্ডোম, গর্ভনিরোধক বড়ি ইত্যাদি) অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় গর্ভসঞ্চার ঘটতে পারে।

কিছু প্রচলিত ধারণা

বেশিরভাগ মানুষের ধারণা ভ্যাসেকটমি করালে পুরুষেরা যৌন মিলনে অক্ষম (Impotent) হয়ে পড়েন। এই ধারণা পুরোপুরি ভুল। এতক্ষণ যাঁরা ধৈর্য ধরে এ লেখা পড়ছেন, তাঁদের নিশ্চয় বুঝতে বাকি নেই যে, শুক্রাণুকে বীর্যে পৌঁছাতে না দেওয়াই **ভ্যাসেকটমি। এরসঙ্গে যৌন মিলন অথবা বীর্য নিষ্ক্রমণের (Ejaculation) অক্ষমতার কোনো সম্পর্ক নেই।** দ্বিতীয়তঃ লিঙ্গের দৃঢ়তা (Erection of Penis) এবং বীর্য নিষ্ক্রমণের (Ejaculation of semen) দুটি প্রক্রিয়াই নির্ভরশীল আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের উপর। এ দুটির কোনোটিই এই অপারেশনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বহু সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ভ্যাসেকটমির পরে যে গুটিকতক পুরুষের যৌন মিলনে অক্ষমতা দেখা দেয়, তার সবগুলিরই কারণ মানসিক— বাজার চলতি ভুল ধারণা সেই মানসিক সমস্যা বাড়ায় বই কমায় না।

কেন করাবেন ভ্যাসেকটমি?

●অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ অপারেশন, খরচ খুবই কম।

●আউটডোরে অথবা প্রত্যন্ত গ্রামে ক্যাম্প করে ভ্যাসেকটমি করে দেওয়া যায়।

●অপারেশন পরবর্তী সমস্যা অত্যন্ত বিরল।

●জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এর সাফল্যের হার অত্যন্ত বেশি (প্রতি ১০০০০টি অপারেশনের মধ্যে মাত্র ১৫ টি জন্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়।

●পুরুষটি চাইলে আবার অপারেশন করিয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রজনন ক্ষমতা ফিরে পেতে পারেন।

●অপারেশনের সময় অত্যন্ত কম এবং অপারেশনের ১ ঘন্টা পরই রোগী বাড়ি চলে যেতে পারেন।

অপারেশন পরবর্তী সমস্যা

●যদিও অত্যন্ত বিরল তবুও কিছু ক্ষেত্রে কাটা জায়গায় সংক্রমণ হতে পারে। তাই ঠিক ভাবে ব্যান্ডেজ করে অপারেশনের জায়গা ঢাকা দিয়ে রাখা ও পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি।

স্পার্ম গ্রানুলোমা (sperm granuloma) -এটিও খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়। অবশ্য আধুনিক পদ্ধতিতে (cauterisation) করে অপারেশন করলে এর সম্ভাবনা থাকে না।

●সামান্য কিছু ক্ষেত্রে শুক্রনালীর কাটা অংশ দুটি নিজেরাই জুড়ে যেতে পারে, ফলে নির্বীজকরণ ব্যর্থ হতে পারে।

কাদের ভ্যাসেকটমি করা যাবে না?

একজিমা (eczema), স্কেবিস (scabies) ইত্যাদি চর্মরোগ থাকলে তা সারিয়ে নিয়ে তারপর অপারেশন করানো উচিৎ।

●হাইড্রোসিল বা হার্নিয়া থাকলে তার অপারেশনের সঙ্গেই ভ্যাসেকটমি করা হয়। আলাদা করে করা উচিৎ নয়।

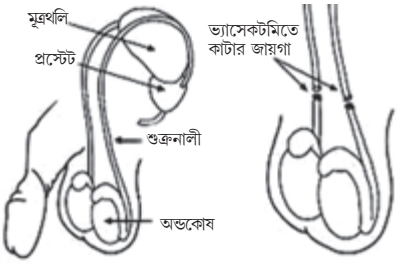

●ভ্যাসেকটমি করাতে ইচ্ছুক ব্যক্তির লিখিত অনুমতিপত্র ছাড়া এই অপারেশন করা আইনত দন্ডনীয়।

এন. এস. ভি. (NSV) কী?

এন. এস. ভি. বা নো স্ক্যালপেল ভ্যাসেকটমি (No-scalpel vasectomy) আসলে ভ্যাসেকটমির সরলীকৃত রূপ। এক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ছুরি (scalpel) ব্যবহার না করে শুধুমাত্র চামড়ায় একটি ফুটো করে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী শুক্রনালীর অংশবিশেষ কেটে বাদ দেওয়া হয়। সুবিধা এই যে, এতে আরও কম সময় লাগে ও রোগী আরও কম সময়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। তবে এই অপারেশন করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্জেন প্রয়োজন।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে ভ্যাসেকটমি খুবই সহজ, নিরাপদ ও কার্যকরী। আর এর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে NSV-র দৌলতে। তাই ভারত সরকারও জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হিসেবে এটিকে তুলে ধরার প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। NSV করিয়েছেন এমন প্রত্যেক পুরুষ বর্তমানে এককালীন ১২০০ টাকা সরকারি অনুদান পান। ডাক্তারদেরও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। সমস্ত গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যাম্প করে NSV করার ব্যবস্থা হয়েছে।

শেষ কথা

কিন্তু তাতেও কি ভারতীয় সমাজে ভ্যাসেকটমি খুব জনপ্রিয় হয়েছে? বোধহয় না। এর আসল কারণ কিন্তু একেবারেই সামাজিক- আমাদেরই সমাজে, যেখানে পুরুষতন্ত্রের শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে গভীরে। এখানে এখনও একজন মায়ের গর্ভযন্ত্রণা এবং সন্তানধারণের পথে পদে পদে মৃত্যুর সম্ভাবনার চেয়ে বড় হয়ে উঠে একজন পুরুষের পুরুষত্ব হারানোর অমূলক আশঙ্কা। আর সেজন্যই হাজার হাজার NSV-র সাইনবোর্ড টাঙানো থাকলেও অধিকাংশ পুরুষই ভ্যাসেকটমির নামে আঁতকে ওঠেন।

"এই বেশ ভালো আছি"— তাই না?

লেখক পরিচিতি : ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে সেখানে জুনিয়ার ডাক্তার হিসাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

হাত ধোওয়া

হাত ধোওয়া? তাই নিয়ে আবার কাগজ নষ্ট করে প্রবন্ধ লিখতে হবে নাকি? আমরা তো জানিই যে হাত ময়লা হলে ধুয়ে ফেলতে হয়— সেটা নিয়ে আবার সাতকাহন করে বলার কি আছে? বলার যে কী আছে সেটাই একেবারে সংক্ষেপে সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন **মানস রঞ্জন মাইতি**।

ছেলের পেট খারাপ আর আমাশা। একবার নয় বারবার। ডাক্তারবাবু বলছেন জলবাহিত রোগ, দূষিত জল থেকে হতে পারে। তাই বাড়িতে ফোটানো জল খায়,স্কুলে, খেলার মাঠে সর্বত্র সে ফোটানো জল সঙ্গে করে ঘোরে। বাড়ির খাবার ছাড়া খায় না। মাছি আটকানোর জন্য বাড়ির সমস্ত জানালায় নেট আর ঘরের কোণে ফ্লাই-ক্যাচার। কিন্তু আমাশা খালি ফিরে ফিরে আসে।

শুধু আমাশা নয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস (যার থেকে জন্ডিস হয়), আন্ত্রিক ইত্যাদি সব জলবাহিত রোগই এ ছেলের হতে পারে। সহজেই হতে পারে ভাইরাস ঘটিত সর্দি-কাশি-জ্বর। কারণ সে খাবার আগে হাত ভালো করে ধোয় না।

এপর্যন্ত পড়েই ভাবছেন তো, এ এমন কি বড় কথা হল? সে ছেলে হাত ধোয় না, অপরিষ্কার, কিন্তু আপনি হাত ঠিকঠাক ধুয়ে নেন? আপনি পরিষ্কার? তবে আসুন, দেখে নিন ঠিক করে হাত ধোওয়া ব্যাপারখানা কি আর পরিষ্কার হাত জিনিসটাই বা কি?

- **হাতে লেগে থাকা জীবাণু বহু রোগের কারণ**
- **সাধারণ হাত ধোওয়ায় হাত পরিষ্কার দেখায়, কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়**
- **কখন হাত ধোওয়ার প্রয়োজন সেটাও আমরা সর্বদা বুঝি না**
- **হাত ধোওয়ার নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে**

হাত ধোওয়া বা হাতের যত্নের প্রয়োজনীয়তা কী?

হাতের পরিচ্ছন্নতা বা ঠিক ভাবে হাত ধোওয়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ঠিকঠাক হাত পরিষ্কার রাখলে এক ব্যক্তি

This could save the lives of 3000 children a day.

The very young are hit hardest by the lack of clean and safe water. The consequence is diarrhoeal disease which kills six thousand children every day of the year. The simple act of washing hands with soap and water could alone cut this figure by almost half. Join the WASH campaign

WASH

থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে রোগ ছড়ানো বন্ধ করা যায়। London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) and International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) -এর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ পেট খারাপ জাতীয় রোগের প্রতিরোধ করা যায় ভালোভাবে হাত ধুলেই। সাধারণ জ্বর, হাঁচি বা কাশি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় যদি সাবান আর জল দিয়ে অপনার হাত বারবার খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া যায়।

আনুবীক্ষণিক জীবাণু যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। আমরা খালি চোখে তাদের দেখতে পাই না। কিন্তু এইসকল জীবাণু হাতের মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢুকে আমাদের কাবু করে ফেলে বা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। তবে একথাও মনে রাখা দরকার কিছু জীবাণু আমাদের কাছে উপকারী-এদের ব্যাপারে পরে কোনোদিন আলোচনা করা যাবে।

এবার আসা যাক হাত ধোওয়া বা হাতের স্বাস্থ্যের কথায়। যে হাতকে দেখে মনে হয় পরিষ্কার তা কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভাষায় পরিষ্কার বলা যায় না। উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

●যদি বাড়ির মেঝেতে কাগজের টুকরো বা অন্য অব্যবহার্য পদার্থ পড়ে থাকে তখন আমরা বলে থাকি মেঝেটি অপরিষ্কার (unclean) তেমনি হাতের মধ্যে ধুলো, কাদা বা রঙ লেগে থাকে তখন তাকে বলি অপরিষ্কার যা চোখে দেখে বোঝা যায়। এই অবস্থাকে আমরা এরূপ রেখাচিত্রের মাধ্যমে বোঝাই-

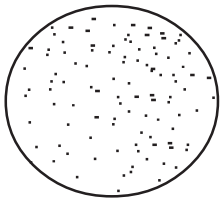

অপরিষ্কার (unclean)

এরপর যখন আমরা ঝাড়ু দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেলি বা হাতটা কেবলমাত্র জল দিয়ে ধুয়ে ফেলি তখন আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি পরিষ্কার কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত নয় (clean but unhygienic)। এই অবস্থাকে আমরা রেখাচিত্রের মাধ্যমে এরূপ বোঝাতে পারি বা বোঝাই—

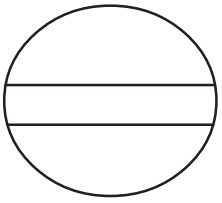

পরিষ্কার কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত নয় (clean but unhygienic)

২. যখন আমরা মেঝেটিকে অপারেশান থিয়েটারের মেঝের মতো জীবাণু নাশক দিয়ে (যেমন ফিনাইল ইত্যাদি) পরিষ্কার করে জীবাণু মেরে ফেলি বা হাতটি জীবাণুনাশক (সাবান,

অ্যালকোহল) দিয়ে মুছে বা ধুয়ে ফেলি তখন অমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পরিষ্কার (hygienically clean)। এই অবস্থাকে আমরা রেখাচিত্রের মাধ্যমে এভাবে বুঝিয়ে থাকি।

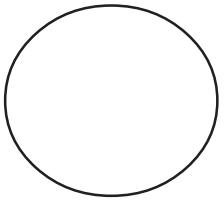

স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পরিষ্কার (hygienically clean)

সঠিক ভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতি ও হাত ধোয়ার উপকরণ

উপকরণ ঃ সাবান, জীবাণুমুক্ত জল এবং পরিষ্কার তোয়ালে বা হাত শুকনো করার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। যে কোনো সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া চলবে এবং সাবান বেশি দামী বা কম দামের কোনো পার্থক্য নেই।

প্রথমে জলে হাত ভিজিয়ে নিতে হবে। এরপর সাবান (তরল বা শক্ত) দিয়ে ভালোভাবে ফেনা তৈরি করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে সাবান দিয়ে হাত ভালো ভাবে ফেনা না করলে শৌচকার্যের পরে হাতের দুর্গন্ধ যাবে না।

তালুর সঙ্গে তালু

ডান হাতের তালু দিয়ে বাঁ হাতের পেছন এবং বাঁ হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের পেছন

তালুর সঙ্গে তালু, আঙুলের সঙ্গে আঙুল

ক. হাতের তালু ঘসা

খ. এরপর ডান হাতের তালু বাঁ হাতের উপরে ঘসা এবং বাঁ হাতের তালু ডান হাতের তালুর উপরে ঘসা

গ. দু হাতের আঙুলের মধ্যে ঘসা

ঘ. দুহাত পরস্পর সংবদ্ধ করে দুহাতের আঙুলের পিছন দিকে পরস্পর-বিপরীত তালুর উপর রেখে বন্ধ করে ঘসা

ঙ. ডান হাতের বুড়ো আঙুল বাম হাতের আঙুল দিয়ে ঘসা

চ. ডান হাতের তালুর উপর বাম হাতের আঙুল দিয়ে উপর নিচে ঘসা আবার বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের আঙুল দিয়ে উপর নিচে ঘসা

আঙুলের পেছনটা অন্য হাতের সঙ্গে, তালু ও আঙুল যুক্ত ভাবে

বুড়ো আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘসা

আঙুল ভাঁজ করে অন্য হাতের তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘসা

ছ. এরপর পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে হাতের জল শুকনো করা বা ড্রায়ার যন্ত্রের সাহায্যে হাত শুকনো করা। দুটির কোনোটিই না থাকলে হাত ঝেড়ে শুকনো করা।

কখন হাত ধোয়া উচিত

যেসব কাজে আগে হাত ধোবেন

- খাদ্য পরিবেশনের আগে
- খাওয়ার আগে
- হাত যখন চোখে দেখে অপরিষ্কার বলে মনে হয়
- বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে এসে
- নিজে ওষুধ খাওয়ার আগে বা অপরকে ওষুধ খাওয়াবার আগে
- কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের আগে

যেসব কাজের পরে হাত ধোবেন

- শৌচকার্যের পরে
- বাচ্চাদের পায়খানা পরিষ্কারের পরে। ন্যাপি পরিবর্তনের পর।
- নাকের সিকনি, লালা, বমি হাতে লাগার পর।
- ঝুঁকিযুক্ত কাঁচা খাবার (যেমন মুরগীর মাংস) হাতে লাগার পর।
- রোগীর পরিচর্যা করার পর।
- রোগী পরীক্ষা করার পর।
- পোষা জন্তু বা অন্য জন্তুর গায়ে হাত লাগার পর।

মনে রাখবেন উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ না। যেমন কেউ দোতলা থেকে এক বালতি ময়লা জল আপনার গায়ে ফেলে দেবার পরেও আপনাকে হাত এবং সারা শরীর ধুতে হবে। কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতি তো বর্ণনা করা সম্ভব নয়— আপনাকে কিছুটা বুঝে নিতে হবে।

পৃথিবীর সব থেকে বুদ্ধিমান জীব সামান্য জীবাণুর কাছে হেরে যাবে তা কখনো কাম্য নয়। তাই প্রত্যেকের উচিত ভালো করে হাত ধোয়া। এক কথায় নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতের মুঠোয়। Your Health in your Hands.

লেখক পরিচিতি : মানস রঞ্জন মাইতি, এম এস সি, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (ওয়াটার সেফটি), ইউরোপিয়ান কমিশন এইড ডিপার্টমেন্ট (ECAD)-এর পরিচালনাধীন 'পোস্ট আয়লা রিকভারি প্রজেক্ট ২০১০-২০১১' তে ওয়াশ কনসালটেন্ট, এ ডি আর এ (Wash Consultant, ADRA) পদে কাজ করছেন।

আত্মহত্যা

''এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি/ রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি/ আঁধার ঘোঁজের বুকে ঘুমায় এবার;/ কোনোদিন জাগিবে না আর।'' (জীবনানন্দ) তবু মানুষ এই ঘুম চেয়ে নেয় জীবনের কাছে। কোনোদিন জাগিবে না আর জেনে বিদায় নেয়, স্বেচ্ছায়। কেন যে সে তা চায় সে এক অপার বিষন্ন বিস্ময়- উত্তরটা সত্যি সত্যিই কেউ জানে না। তবু উত্তরের শীতল গভীরতায় প্রবেশ না করেও মানুষ হাত বাড়াতে জানে। আত্মহত্যার দিকে এক পা বাড়িয়ে থাকা মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে আর একটি উষ্ণ হৃদয়। আত্মহত্যার প্রবণতার পটভূমি ও বিপন্ন মানুষটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব-— লিখছেন ডা. সুমিত দাশ।

খবরটা আপনাদের চোখ এড়ায়নি নিশ্চয়ই। খারাপ খবর। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে এবং বাড়ির পাশে বর্ধমানে, হুগলীতে চাষীরা আত্মহত্যা করছে। কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েছে আমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তারাও। একদল বলছে ঋণের দায়ে ফসলের দাম না পেয়ে এরা আত্মহত্যা করেছে... আর একদল বলছে তাঁদের কাছে এমন কোনো খবর নেই... পারিবারিক গোলযোগ, অবসাদে আত্মহত্যা করছে। কোথাও আবার ত্রিভূজ প্রেমের গল্প। আমরা ভাবছি মরার আগে তাঁরা যদি মরার আসল কারণটা বলে যেতেন, কত ভালোই না হত। বুদ্ধিজীবি হয়তো বা ভাবছেন, একেই বলে চাষাড়ে বুদ্ধি! তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন, এঁরা আত্মহত্যা করছে। তবে কেবলমাত্র কৃষকশ্রেণীর আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করা আজকে আমাদের বিষয় নয়, তার জন্য গুণীজনেরা আছেন। আজকের বিষয় 'আত্মহত্যা'।

আত্মহত্যার সমস্যার গভীরতাঃ ভারতবর্ষে প্রতিবছর ১০০০০০-এর মতো মানুষ আত্মহত্যা করেন। আমেরিকায় বছরে ৩০০০০-এর মতো মানুষ আত্মহত্যা করেন, যেখানে খুন হন ২০০০০ মানুষ। বর্তমানে কমবয়সীদের (১৫-২৪ বছর) মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ছে। পৃথিবীর সর্বপ্রধান আত্মহত্যার স্থান হচ্ছে সানফ্রানসিস্কোর গোল্ডেন গেট ব্রীজ। ১৯৩৭ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে ৮০০-র বেশি জন আত্মহত্যা করেছেন।

কাদের ঝুঁকি বেশিঃ বিভিন্ন সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কতকগুলি বিষয়ের উপর আত্মহত্যার প্রবণতা নির্ভর করে।

লিঙ্গঃ পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় চারগুণ বেশি আত্মহত্যা করেন, কিন্তু মহিলারা পুরুষদের তুলনায় চারগুণ বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আত্মহত্যার প্রচেষ্টার সফলতার হারের এই পার্থক্য, তার মূল কারণ পদ্ধতিগত। পুরুষরা গলায় দড়ি, উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া, ট্রেন লাইনে ঝাঁপানো বা কীটনাশক খাওয়া, বন্দুকের ব্যবহার বেশি করেন। তুলনায় মহিলারা ঘুমের ওষুধ বেশি ব্যবহার করেন। সারা পৃথিবীতে আত্মহত্যার সবথেকে ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে গলায় দড়ি দেওয়া।

বয়স : পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৫ বছর হচ্ছে আত্মহত্যা প্রবণ। ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী বৃদ্ধরা কম বয়সীদের থেকে কম চেষ্টা করেন কিন্তু আত্মহত্যায় সফল হন বেশি।

বিবাহ : অবিবাহিতদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা বিবাহিতদের থেকে বেশি। একা, কখনো বা বিয়ে হয়নি এরকম পুরুষদের আত্মহত্যার হার বিবাহিতদের তুলনায় দ্বিগুণ। বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারী-পুরুষদেরও আত্মহত্যার হার বেশি।

পেশা : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদে যাঁরা আসীন তাঁদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। একজনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার পতনও আত্মহত্যার কারণ হয়। কাজে যুক্ত থাকাকে ধরা হয় আত্মহত্যারোধী টীকা। বেকার থাকা আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দেয়। **সমস্ত রকম পেশাদারদের মধ্যে চিকিৎসকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সব থেকে বেশি, বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসকদের। আবার সমস্ত চিকিৎসকদের মধ্যে মানসিক রোগের চিকিৎসকদের আত্মহত্যার প্রবণতা সবথেকে বেশি—** তারপর একে একে আসছে চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং অজ্ঞান করার ডাক্তার বা অ্যানাসস্থেসিস্ট।

শারীরিক অবস্থা : দেখা গেছে আত্মহত্যা করেছেন এমন মানুষের এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বের মধ্যে কোনো শারীরিক রোগের চিকিৎসা হয়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণা, চলৎশক্তি ব্যাহত হওয়া, ডায়ালিসিস- বিশেষ করে মহিলাদের হলে আত্মহত্যার সম্ভাবনা বাড়ে।

মানসিক অবস্থা : যাঁরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বা আত্মহত্যা করেন তাঁদের শতকরা ৯৫ ভাগের মানসিক রোগ থাকে। মানসিক রোগীদের মধ্যে যাঁদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁদের ভর্তি হওয়ার প্রথম সপ্তাহে এবং হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরের তিন মাসের মধ্যে আত্মহত্যার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। মানসিক অবসাদ রোগে ভুগছেন যাঁরা তাঁদের ১০-১৫ শতাংশ আত্মহত্যা করেন। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর ১০ শতাংশ আত্মহত্যা করেন।

নেশা : নেশাড়ুদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা সাধারণ মানুষের থেকে বেশি। মদ্যপানে আসক্তদের শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ আত্মহত্যা

করেন।

আগে আত্মহত্যার প্রচেষ্টাঃ আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এমন মানুষের আবার আত্মহত্যা করার চেষ্টার সম্ভাবনা বেশি- বিশেষ করে প্রথম তিন মাসের মধ্যে।

আত্মহত্যার কারণ : মানুষ বাঁচতে চায়। টাকাপয়সা উপার্জন করা, শরীর খারাপ হলে চিকিৎসা করা সবই এই জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে। তাই একটা মানুষ যখন আত্মহত্যা করে বুঝতে হবে তাঁর কাছে বেঁচে থাকাটাই এত যন্ত্রণাদায়ক যে তার থেকে মৃত্যু অনেক আরামদায়ক। তাই আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে হয়।

সমাজ বিজ্ঞানগত ব্যাখ্যাঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানী এমিল ডারখিম (Emile Durkheim আত্মহত্যাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন— ইগোইস্টিক (Egoistic) অল্টুইস্টিক (Altruistic) এবং অ্যানোমিক (Anomic)। যাঁরা সমাজে খুব দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নন এবং আত্মহত্যা করেন তাঁরা ইগোইস্টিক শ্রেণীর। যে জন্য অবিবাহিতরা আত্মহত্যা প্রবণ। বিবাহিত, সন্তান নিয়ে সংসার করছেন যাঁরা তাঁরা অনেক বেশি সমাজবদ্ধ। একই ভাবে গ্রামের মানুষদের সমাজবদ্ধতা বেশি হওয়ায় শহুরে মানুদের তুলনায় কম আত্মহত্যা প্রবণ। অল্টুইস্টিককে আবার একটা বিপরীত ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এরা নিজের গোষ্ঠীতে এতবেশি সংবদ্ধ যে গোষ্ঠীর জন্য বা সমূহের জন্য নিজে আত্মহত্যা করতে পারেন। যেমন কোনো সৈনিক নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে অ্যানোমিকদের ক্ষেত্রে বলা হয় কোনো কারণে নিজস্ব সামাজিক অবস্থান ব্যাহত হলে এঁরা আত্মহত্যা করেন। যেমন অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি তাঁর গোষ্ঠীর বা সমাজের প্রথাগত প্রত্যাশাগুলি পরিপূরণ করতে পারেন না। তাছাড়া সমাজের নৈতিকতার পতনের কারণও তাঁদের ভারসাম্য হীনতার কারণ হয়।

মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ ফ্রয়েড মনে করতেন কেউ হয়তো কোনো কারণে কাউকে খুন করার কথা ভেবেছিলেন। তারপর সেই ইচ্ছা অবদমন করেন। পরবর্তীকালে নিজের প্রতি আক্রোশ হিসাবে সেই ইচ্ছা প্রকাশ পায়- তাই আত্মহত্যা।

বর্তমানে তাত্ত্বিকরা মনে করেন **আত্মহত্যার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট একটিমাত্র মনোগতি কাজ করে না।** আত্মহত্যা যিনি করেন তাঁর জীবন সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর কল্পলোকে কী ধরনের চিন্তা আসে এগুলোর উপর আত্মহত্যার কারণ নির্ভর করে। যেমন প্রতিশোধের ইচ্ছা, ক্ষমতা, লোককে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা, শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা এগুলি কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে পলায়নী মনোবৃত্তি, দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের ইচ্ছা, পুনর্জন্ম ইত্যাদি ভাবনাও কাজ করে। অনেকক্ষেত্রে একবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা অবসাদকে সারিয়ে দেয়, যদি সেই মানুষটির নিজস্ব কল্পলোকে নিজেকে শাস্তিদান করাটা প্রধান বিষয় হয়। তবে অবসাদ রোগে আত্মহত্যার মূল কারণ জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চরম হতাশা।

> সমস্ত রকম পেশাদারদের মধ্যে চিকিৎসকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সব থেকে বেশি, বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসকদের। আবার সমস্ত চিকিৎসকদের মধ্যে মানসিক রোগের চিকিৎসকদের আত্মহত্যার প্রবণতা সবথেকে বেশি।

অন্যান্য কারণ : দেখা গেছে আত্মহত্যা প্রবণদের মস্তিষ্কে সেরটনিন নামক রাসায়নিক সংযোগকারী পদার্থের ক্ষরণ কম হয়। এছাড়া জিনগত কারণও আত্মহত্যার পিছনে কাজ করে।

চিকিৎসা : ঠিকমতো অনুধাবন ও চিকিৎসা করতে পারলে অধিকাংশ মানসিক রোগীর আত্মহত্যা রোধ করা যায়। আত্মহত্যা প্রবণতার মূল্যায়ণ ঠিক ভাবে করা ভীষণ জরুরি। রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তাঁর আত্মহত্যার চিন্তা আছে কিনা... তারপর ইচ্ছা হচ্ছে কিনা... ইচ্ছা হলে কোন পদ্ধতিতে করবে, সেটার কোনো পরিকল্পনা করেছেন কিনা... সবশেষে জানতে হবে আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন কিনা। তারপর সেইমতো গুরুত্ব দিতে হবে। আরও কতকগুলি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা না থাকা, ব্যক্তিগত জিনিস অন্যকে দিয়ে দেওয়া, উইল করা, কোনো কারণে জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া— এগুলি আত্মহত্যার প্রচেষ্টার নির্দেশিকা হতে পারে। বেশি আত্মহত্যা-প্রবণদের ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়। তা সম্ভব না হলে বাড়িতে রেখেও চিকিৎসা করা যায়। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার করা হয় এবং কাউন্সেলিং করা হয়।

যে কথাগুলি ভোলা উচিৎ নয় : সাধারণভাবে মানুষের ধারণা **যে আত্মহত্যার কথা বলে সে আত্মহত্যা করে না। বিষয়টা ঠিক উল্টো—** আত্মহত্যার চেষ্টার আগে মানুষ তাঁর ইচ্ছার কথা কাউকে না কাউকে প্রকাশ করে। তাই আত্মহত্যা করার কথাকে সর্বদা গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

●কেবলমাত্র দুর্বল মনের মানুষেরাই আত্মহত্যা করেন না। পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানসিক কোনো কারণে যে কেউ আত্মহত্যা করতে পারেন।

●অবসাদগ্রস্ত মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ তাঁর মনে আত্মহত্যার চিন্তা আসছে কিনা। অনেকে বাবেন আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। আদতে ব্যাপারটা তা নয়। আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন এমন মানুষ তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে অনেক ক্ষেত্রে মনের ভার লাঘব করেন। আলোচনা করে আত্মহত্যার চিন্তা কারোর মনে বাইরে থেকে গেঁথে দেওয়া যায় না।

●আত্মহত্যা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সব সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণী, সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে প্রায় সমান ভাবে বিদ্যমান।

●আত্মহত্যা-প্রবণ মানুষের ওপর তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, হিতাকাঙ্খী সবাই মিলে নজরদারি করা উচিৎ।

লেখক পরিচিতি : **ডা. সুমিত দাশ**, এম বি বি এস, ডি পি এম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তা ছাড়াও যুক্ত আছেন শ্রমজীবি মানুষদের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা একটি ক্লিনিকের সাথে।

ডাক্তারের ডেস্ক

১. আমার মেয়ের ১৭ বছর বয়স। ওর খালি সাদা ধাত যায়। সে জন্য চোখ ধোঁয়া হয়ে যায়। দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে।

বিলকিস বেগম, বাইনান, হাওড়া

২. আমার বয়স ২৮ বছর। আমার তিনটি বাচ্চা আছে। বেশ কিছুদিন ধরে আমার ভীষণ সাদা স্রাব হচ্ছে। পেচ্ছাপের রাস্তায় চুলকানি হচ্ছে। আমার শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কি করে এগুলো কমবে? -সাহানারা বেগম, আমতা, হাওড়া

উত্তরঃ আপনাদের দু'জনকেই প্রথমে যেটা জানাতে চাই তা হল সাদা স্রাব হওয়ার জন্য শরীর দুর্বল হয়ে যাবার, মাথা ঘোরা বা চোখ ধোঁয়া হয়ে যাবার কোনও কারণ নেই।

বয়ঃসন্ধির সময় মেয়েদের শরীরে হরমোনের প্রভাবে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। ডিম্বাশয় নিঃসৃত হরমোনের প্রভাবে জরায়ু যেমন আয়তনে বাড়ে, এর ভেতরের গ্রন্থিগুলোও আয়তনে ও সংখ্যায় অনেক বেড়ে ওঠে, রক্ত চলাচলও অনেক বেড়ে যায়। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে মাসে মাসে যেমন ঋতুস্রাব শুরু হয়, ঋতুচক্রের কোনো কোনো পর্বে, যেমন মাসিক শুরু হবার দু'চারদিন আগে, কিংবা যে সময় ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুটি বেরিয়ে আসে অর্থাৎ ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে, গ্রন্থিগুলি থেকে রস নিঃসরণ অনেক বেড়ে যায় এবং সেটাই জরায়ু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে যোনিপথের বাইরে চলে আসে। এটা কোনো রোগ নয়, এটা আমাদের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াগুলির একটি। অর্থাৎ সন্তানধারণক্ষম বয়সে মাসের মধ্যে কোনো কোনো সময়ে যদি সাদা স্রাব যায় এবং তাতে কোনো রকম জ্বালা, যন্ত্রণা, চুলকানি বা দুর্গন্ধ ইত্যাদি না থাকে তবে তা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু সাদা স্রাব বা যোনি স্রাব কখনও কখনও জীবাণু সংক্রমণের কারণেও হয়ে থাকে; বিশেষ করে যোনি এবং তার আশে পাশের অংশে কয়েক ধরণের অণুজীব দ্বারা সংক্রমণে। এটি সাধারণ ভাবে বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়। কারণ

সংক্রমণ অনেক ক্ষেত্রে হয় যৌন সংসর্গের মাধ্যমে। এই সমস্ত সংক্রমণ হলে সাদা স্রাব লাগাতার চলতে থাকে এবং তার সাথে যোনির ভিতরে এবং বাইরে চুলকানি, জ্বালা ইত্যাদি অনুভূত হয় এবং স্রাবটিতে কখনও কখনও হলুদের ভাব থাকে, কখনও বা দই বা ছানার মতো হতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই একসাথে হওয়া উচিত। এই ধরনের সংক্রমণ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে, দীর্ঘদিন গর্ভনিরোধক ওষুধ যারা ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে, বা অন্য কোনো কারণে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে বেশি হতে পারে।

জরায়ুমুখের সংক্রমণেও কখনও সাদা স্রাব হয় এবং এই সংক্রমণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক হয়ে যায়। বাচ্চার জন্মের সময় অথবা গর্ভপাত করানোর সময় কখনও জরায়ুমুখে চোট আসে, সেইখানে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাথে সাথে এর চিকিৎসা হয় না, তা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণে পরিণত হয়, পরবর্তীকালে এর জন্য তলপেটে ব্যথা এবং সাদা স্রাব হতে থাকে। ওষুধ দিয়ে এর স্থায়ী নিরাময় সম্ভব হয় না যদিও সাময়িকভাবে আরাম দেওয়া যায়। জরায়ুমুখের ব্যাকটেরিয়া-জনিত সংক্রমণ হঠাৎ করেও হতে পারে। এক্ষেত্রে পূঁজের মতো সাদা স্রাব হতে পারে, পেচ্ছাপে জ্বালা করতে পারে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে এটি পুরোপুরি সেরে যায়।

সংক্রমণজনিত কারণে যে সাদা স্রাব হয় তা কম রাখার জন্য কতকগুলি সাবধানতা নেওয়া যেতে পারে। পুকুরের জলে কোমর ডুবিয়ে স্নান করা উচিত নয়। মাসিক চলাকালীন সব সময় পরিষ্কার কাচা কাপড় বা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা উচিত। যোনি কখনই সাবানজল বা ডেটলজলে ধোয়া উচিত নয়। সাদা স্রাবের জন্য অস্বস্তি হলে অল্প গরম জলে পরিষ্কার করা যেতে পারে। গর্ভপাত করালে তেমন জায়গাতেই করানো উচিত যেখানে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তা করা হয়। বাড়িতে বাচ্চার জন্ম দিলে সবসময়ই খেয়াল রাখা উচিত যাতে জীবাণু সংক্রমণ না ঘটে।

জরায়ুমুখের বাইরের দিকে কোষের কিছু পরিবর্তনের কারণেও কখনও জরায়ুমুখ থেকে রস নিঃসরণ বেড়ে যায় (সার্ভাইকাল ইরোশন)। বিশেষ ভাবে যাঁরা বহুদিন ধরে গর্ভনিরোধক বড়ি খান তাদের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে। কোনো ওষুধ দিয়ে এই স্রাব বন্ধ করা যায় না। বিশেষ সার্জিকাল পদ্ধতিতে ওই অংশটিকে নষ্ট করে দিলে এই স্রাব বন্ধ হয়।

জরায়ু এবং জরায়ুমুখ ক্যান্সারের জন্য যখন সাদা স্রাব হয়, তখন তা হয় দুর্গন্ধযুক্ত, কখনও বা রক্ত মিশ্রিত। এত সাথে অন্যান্য উপসর্গও থাকে। ক্যান্সার রোগটির জন্যই এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর দুর্বল লাগতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে, নচেৎ নয়।

— উত্তর দিয়েছেন ডা. চঞ্চলা সমাজদার, এম বি বি এস, ডি জি ও, স্ত্রীরোগ বিদ্যা-বিষেষজ্ঞ। তিনি হাওড়ার শ্রমজীবি মানুষের এক নিজস্ব ক্লিনিকে যুক্ত আছেন।

●আমার বয়স ২৮ বছর। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। সম্প্রতি মনে হচ্ছে শীঘ্রপতন হচ্ছে। বন্ধুদের কথা শুনে মনে হয় আমার ক্ষমতা যেন কম। এর কি চিকিৎসা করাবো? শুনেছি আয়ুর্বেদে বা হেকিমী মতে ভালো ওষুধ আছে- সেটা কি ঠিক?

—বিকাশ মন্ডল, দুর্গাপুর -৬

উত্তরঃ আপনার চিঠি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার নয়— বিয়ের আগে থেকেই আপনার শীঘ্রপতনের সমস্যা ছিল কিনা। শীঘ্রপতনকে

ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশান (premature ejaculation) বা সংক্ষেপে PME। মূলত দুটি কারণে PME হয়— ১. শারীরবৃত্তিয় কারণ— যেখানে বীর্যস্খলন স্নায়ুতে সমস্যা থাকে, তাই শীঘ্রপতন হয়। ২. মানসিক কারণ- অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের আগে থেকে অনেক পুরুষেরই যোনি এবং যৌন সম্পর্ক বিষয়ে ভীতি থাকে। কেউ হয়তো বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক করেছেন, কোনো যৌনকর্মীর সাথে বা বান্ধবীর সাথে, কিন্তু অপরাধবোধে ভুগছেন। এর ফলে পরবর্তীকালে শীঘ্রপতনের সমস্যা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহপূর্ব বা পরবর্তী যৌন সম্পর্ক এমন জায়গায় করেছেন যেখানে ধরা পড়লে অস্বস্তিকর হতে পারে, সেই উদ্বেগেও শীঘ্রপতন হতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলে বা কোনো কারণে অবসাদ বা উদ্বেগে ভুগলেও শীঘ্রপতন হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

শীঘ্রপতন বা PME -র চিকিৎসা আছে। প্রথমতঃ মনোচিকিৎসা- কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে যৌনতা সম্পর্কে দ্বন্দ্ব দূর করা হয়। এছাড়া মাস্টারস এবং জনসন (Master and Jhonson) পদ্ধতিতে শীঘ্রপতনের সমস্যা দূর করা হয়। এই পদ্ধতিতে পুরুষ মানুষটির নারী সাথীকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা- উদ্বেগ ও অবসাদরোধী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। আর আয়ুর্বেদ বা হেকিমী ওষুধ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে সাধারণ ভাবে একটা কথা বলতে পারি মূল ধারার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইরের ধারাগুলির কার্যকারিতা খুব প্রামাণ্য নয়।

এই পরিসরে সবকিছু বলা সম্ভব নয়। সবথেকে ভালো হয় আপনি কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। হতাশ হওয়ার কিছু নেই, শীঘ্রপতনের চিকিৎসা আছে।

—উত্তর দিয়েছেন ডা. সুমিত দাশ, এম বি বি এস, ডি পি এম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তা ছাড়াও যুক্ত আছেন শ্রমজীবি মানুষদের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা একটি ক্লিনিকের সাথে।

●আমার মুখে কালো দাগ বেরিয়েছিল। সবাই বলল বেট... মলম লাগালে ভালো হয়ে যাবে। মাসখানেক লাগালাম, ভালো হল কিন্তু বন্ধ করে দিতে আবার হল। এই ভাবে খেপে খেপে দশ-বারো মাস লাগিয়েছি। এখন ওষুধ না

লাগালে কষ্ট হয়, জ্বালা করে। মুখের লোম বেরিয়েছে- কি বিচ্ছিরি বলুন তো! এটা কি মেচেতা? কি করলে রেহাই পাব?

—সুপ্রিয়া হালদার, বারাসত। উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তরঃ আপনি একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন, যদিও কাজটা মোটেই ভালো করেন নি। ওই কাজটা বলতে আমি বেট... মলম লাগানোর কথা বলছি। মলমটার পুরো নামটা আমি লিখলাম না, কিন্তু আমরা যাঁরা ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁরা সবাই জানি যে অনেকে, বিশেষ করে অল্প বয়সি মেয়েরা আজকাল মুখের যে কোনো দাগ তোলার মহৌষধ হিসেবে ওই ওষুধটি ব্যবহার করছেন। আরও মুস্কিল, অনেকে আবার ফর্সা হবার জন্য বা তাঁদের ভাষায় মুখের 'গ্ল্যামার' বাড়ানোর জন্য, মুখে ঐ স্টেরয়েড মলমটি লাগাচ্ছেন। একই উদ্দেশ্যে বেট... ছাড়াও আরও কয়েকটি ব্র্যান্ড নামের মলম ব্যবহার করা হচ্ছে। সবকটিই স্টেরয়েডযুক্ত মলম। মজা হল যে কোনো ডাক্তারবাবুই ঐসব মলম যে কোনো দাগ তোলার জন্য বা ফর্সা হবার জন্য, বা মুখের 'গ্ল্যামার' বাড়ানোর জন্য প্রেসক্রিপশানে লেখেন না। ওষুধ কোম্পানিগুলোও ওই ওষুধগুলোকে দাগ তোলা, ফর্সা হওয়া বা গ্ল্যামার বাড়ানোর ওষুধ হিসেবে বিজ্ঞাপিতও করে না।

কিন্তু ওষুধগুলো ও ভাবেই চলছে। পাড়ার দাদাদিদি, আত্মীয়-বন্ধুর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে এইসব অত্যাশ্চর্য মহৌষধের মহা-কাহিনী। তার কারণ অবশ্য আপনার চিঠিটা ভালো করে পড়লেই পাওয়া যাবে। আপনি লিখেছেন, 'মুখে কালো কালো দাগ বেরিয়েছিল... বেট... মলম... মাসখানেক লাগালাম, ভালো হল কিন্তু বন্ধ করে দিতে আবার হল। এই ভাবে খেপে খেপে দশ-বারো মাস লাগিয়েছি।' স্টেরয়েড মলম লাগালে মুখের চামড়া সাময়িক ভাবে একটু ফর্সা হয়ে যায়। কিন্তু তাতে চামড়ার ক্ষতি হয় বিস্তর। আর মলম বন্ধ করলে যে কে সেই, সাময়িক ফর্সাভাব যায় কেটে, আবার সেই পুরানো কালো দাগ, সেই পুরানো রঙ, গ্ল্যামার-বিহীন ত্বক। 'গ্ল্যামার হীনতায় কে বাঁচিতে চায় বল কে বাঁচিতে চায়!' অতএব পুনরায় বেট... ইত্যাদি মলম। এবারে কিন্তু কাজ কম হয়, ক্ষতি আরও বেশি। সুতরাং কিছুদিন ধরে মলম বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টার পর আবার মলম। এই ভাবে দিন কাটে, মাস যায়। মুখ হয়ে ওঠে লাল, কালো-সাদা ছোপে ভর্তি, খসখসে শিরা বের করা। রোদে গেলে জ্বালা করে অথচ মলমের মহিমা নিয়ে মোহ ঘোচে না, কেননা মলম লাগালে তখনও যে একটু ভালো লাগে। জেনেশুনে বিষ করেছি পান— সুতরাং নিজেকেই নিজে চোখ ঠেরে মলম চলে, বছর ঘোরে এবং মুখে বড় বড় লোম। মহিলারা প্রায়ই আমাদের কাছে আসেন এই অবস্থায়। তখন চিকিৎসা করে আগের ত্বক ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন, ব্যয় সাপেক্ষও বটে। তবু ধৈর্য ধরলে কিছুটা ভালো তো হয়ই।

যে ওষুধগুলো লাগিয়ে সমস্যা হচ্ছে সেগুলো মোটেই খারাপ ওষুধ নয়। বেট... মলমটির কথাই ধরুন। এটি চামড়ার বহু রোগে অত্যন্ত সুফলদায়ী ওষুধ। অন্য ওষুধগুলিও তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খুব কাজের ওষুধ। আগেই বলেছি যে কারণে ওষুধগুলি ব্যবহার করে আপনার ও আপনার মতো হাজার হাজার মানুষের সমস্যা হচ্ছে, সেইসব কারণে ডাক্তারবাবুরা এইসব মলম প্রেসক্রিপশানে লেখেন না। ওষুধ কোম্পানিগুলোও এইসব ওষুধগুলোকে দাগ তোলা, ফর্সা হওয়া বা গ্ল্যামার বাড়ানোর ওষুধ হিসেবে বিজ্ঞাপিত করে না। তবু কেন লোকে লাগায় সেটা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, তবু খুব সংক্ষেপে দু'চার কথা বলছি।

আমাদের দেশে ওষুধ বিক্রির ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বিক্রি করলে দোকানদারের ক্ষতি নেই, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার কোনো সরকারি ব্যবস্থা নেই। কোনো দোকানদার যদি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে

ভাবেন, তিনি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খদ্দেরকে বেচবেন না, তাহলে তাঁর ক্ষতি বিস্তর। রোগী ভাববেন এ আবার কি আবদার! এটা যে তাঁদের ভালোর জন্য করা হচ্ছে তা তাঁরা মানতেই চাইবেন না, বরং পাশের দোকান থেকে বিনি-পয়সায় পরামর্শ সহ ওষুধ কিনে ফিরবেন, সে ওষুধ যে তাঁদের ক্ষতি করতে পারে সেটার সম্ভাবনা মাথায় রাখবেন না। আর্থিক দুরবস্থা, ডাক্তার পাবার সমস্যা, ডাক্তারের ওপর আস্থার অভাব- এইসব এর পেছনে কারণ বটে, তবু এক বড় কারণ হল আমাদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাব। ওষুধ যে আর পাঁচটা জিনিসের মতো নয়, খাবার দোকানের লাড্ডু কি প্রসাধনী দোকানের আলতা বা দর্জির দোকানের জামার মতো নিজের ইচ্ছায় কিনে ব্যবহার করা যায় না, এটা বহু মানুষই বুঝতে চান না। তাই শুধু বেট--- মলমের ক্ষেত্রেই নয়, বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা ভুল সিদ্ধান্ত নেন। শুধু ভুল সিদ্ধান্ত নেন তাই নয়, সিদ্ধান্ত নেবার সঠিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই। তাছাড়া দুটো বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার, যদিও তার বিশদে যাবার পরিসর এখানে নেই। প্রথমতঃ ফর্সা হবার জন্য বা 'গ্ল্যামার' বাড়ানোর জন্য আমাদের সমাজ ব্যক্তির ওপর বড় বেশি চাপ তৈরি করে, বিশেষ করে মেয়েদের ওপর। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির যে সার্বিক অনুপস্থিতি রয়েছে তা থেকে ওষুধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে এক অযৌক্তিক অতি-বিশ্বাসের জন্ম হয়। রোগী মনে করেন তাঁর সমস্ত ধরনের সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব- শুধু সঠিক ওষুধটি খুঁজে বার করতে পারলেই হল। তাই যখন পাড়ার বন্ধু বলে যে তাঁর দাদা বেট... মলমে সেরে গেছে, রোগী তখন অন্ধের মতো সেটি আঁকড়ে ধরেন। বোধকরি ভাবেন এটা গুপ্তমন্ত্র বা তুকতাক গোছের ব্যাপার, তাই তাকে ডাক্তার সে ওষুধের খোঁজ সহজে দেবেন না; তিনি বন্ধুর কাছ থেকে ভারি ফাঁকতালে সে গোপন কৌশলটি করায়ত্ত করেছেন।

যা হোক আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আপনার ত্বকে প্রথমে যে কালো দাগগুলি ছিল সেগুলি হয়তো মেচেতা ছিল, সেটা কোনো ত্বক বিশেষজ্ঞ মলম লাগাতে শুরু করবার আগে দেখলেই বলতে পারতেন, এবং তার ফলপ্রসূ চিকিৎসাও মোটামুটি করতে পারতেন। এখন আপনার যে সমস্যা তাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে 'টি এস ডি এফ' (টপিক্যাল স্টেরয়েড ড্যামেজড ফেস)। ডাক্তারের কাছে গিয়ে বেশ লম্বা চিকিৎসা করলে খুব সম্ভব রেহাই পাবেন। 'খুব সম্ভব' বলছি কেননা লাগানোর স্টেরয়েড ভুল ভাবে বহুদিন ব্যবহার করলে কিছু কিছু ক্ষতি স্থায়ী হয়ে যায়। আপনার কতটা ক্ষতি হয়েছে তার ওপর নির্ভর করছে আপনি সারবেন কিনা।

— উত্তর দিয়েছেন ডা. জয়ন্ত দাস, এম বি বি এস, এম ডি, বর্তমানে একটি বেসরকারি পোস্ট-গ্র্যজুয়েট মেডিক্যাল কলেজে চর্মরোগ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক।

কুইজের উত্তর

১। ১৯০৯ সালে, কসৌলিতে ২। ইয়োসিনোফিল ৩। সমুদ্রতল থেকে অনেক উঁচু পাহাড়ি জায়গায় ৪। মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি ৫। 'বেস অব দ্য স্কাল' বা করোটির নীচের অংশ ৬। প্যারোটিড গ্রন্থি ৭। অ্যামানিটা ফ্যালয়ডিস ৮। অক্ষিগোলকের ভিতরের চাপ বেড়ে যায় ৯। অ্যাট্রোপিন ১০। জলাতঙ্ক ১১। সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস থেকে ক্যান্সার হতে পারে ১২। নেফ্রন ১৩। নিউমোকোনিয়োসিস ১৪। এক্লাম্পসিয়া ১৫। ইউস্টেসিয়ান নালী

● চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব

একটি নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন

হুগলীর সোদপুর গ্রামে স্বাস্থ্যের বিকল্প ব্যবস্থার প্রত্যাশা জাগিয়ে, 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-কে বাস্তবায়িত করতে ও সুলভমূল্যে সবার কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে 'সর্বসেবা' কমিউনিটি হাসপাতালের পথ চলা শুরু হল। গত ২০ মার্চ ২০১২ এই হাসপাতালের উদ্যোক্তারা সোদপুরে এক সুন্দর স্বাস্থ্যমেলা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে 'সর্বসেবা'-র উদ্বোধন করলেন। শোভাযাত্রা, চিকিৎসা-শিবির এবং সংগঠক-শুভানুধ্যায়ী- বিশিষ্টজনের সুচিন্তিত বক্তৃতা— এসবের পরে এদিনের প্রধান অতিথি আই পি এস ড. নজরুল ইসলাম 'সর্বসেবা'-র অফিস ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তাঁর এবং নানা বক্তার কথায় আমাদের দেশে গ্রাম ও শহরের চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ফারাকের কথা উঠে আসে। গ্রামে রোগ-প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার আবশ্যিকতা ও নিজেদের সমস্যা সমাধানে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার জন্যই 'সর্বসেবা' ধরনের স্থানীয় গণউদ্যোগের এত গুরুত্ব— 'সর্বসেবা'-র সংগঠক ও সহযোগী থেকে সমস্ত আমন্ত্রিত বিশিষ্টজন এ'বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দেন।

'সর্বসেবা সার্থকনামা হয়ে উঠবে, মানুষের বুকে এই আশা জাগিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিমাপ্তি হয়।

advt.

With Best Compliments from

Dabur India Ltd.

fem®

Quest for excellence in skin & Hair Care

Dabur India Ltd. (Fem Pharma Division)
D-55, MIDC, Ambad, Nashik-422010
E-mail : pharma@dabur.com

অস্থিমজ্জা পরীক্ষা নিয়ে দু-চার কথা

বোন-ম্যারো পরীক্ষা, বা বাংলায় বললে অস্থিমজ্জা পরীক্ষা। হাড় ফুটো করে এই যে পরীক্ষাটি হয় তার সাতকাহন শোনাচ্ছেন **ডাঃ দেবাশিস চক্রবর্তী**।

ঝাড়খন্ডের কোনো এক অজ গাঁ থেকে মেডিকেল কলেজে দেখাতে এসেছে বছর দশেকের বাচ্চা কিশোর বেসরা। তার জ্বর সারছে না, রক্তাল্পতায় হাতপায়ের পাতা সাদাটে, পেটভর্তি বিরাট পিলে আর লিভার, অথচ ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ম্যালেরিয়ার ওষুধে জ্বর সারছে না। ভর্তি করে ডাক্তারবাবুরা অনেক আলাপ আলোচনা করে বললেন, বোন ম্যারো পরীক্ষা করাতে হবে। বুকের সামনের হাড়, যার নাম স্টারনাম, সেটাকে ফুটো করে অস্থিমজ্জা অর্থাৎ বোন ম্যারো সংগ্রহ করা হল। প্যাথোলজির ডাক্তারবাবু দেখে ভারি উত্তেজিত, ডিপার্টমেন্টের সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলেন- অস্থিমজ্জায় বসে আছে কালাজ্বরের জীবাণু।

নৃপেন মাঝি, বয়স চল্লিশ। ভীষণ দুর্বল। স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসক বলেছেন রক্তাল্পতা, আর আয়রণ টনিক-বড়ি খেয়েছেন গাদাগুচ্ছের, কাজ হয়নি। অতএব হাসপাতালে এবং বোন ম্যারো পরীক্ষা। ডাক্তারবাবু দেখে হতাশভাবে ঘাড় নাড়লেন- নাঃ, বোন ম্যারো একেবারে শুকিয়ে গেছে, রক্ত তৈরি করার কারখানাটাই লোপাট। ডাক্তারি ভাষায় অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল জ্বরের জন্য ক্লোরামফেনিকল খেয়েছেন বেশ কিছু দিন আগে— খুব সম্ভব ক্লোরামফেনিকলের বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারই ফলে অস্থিমজ্জা শুকিয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, ক্লোরামফেনিকলের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হয়নি।

শুভস্মিতা ঘটক। পাঁচ বছরের মেয়েটি দ্রুত রোগা আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল জ্বরে ভুগে ভুগে। রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারের সন্দেহ হল- অস্থিমজ্জা পরীক্ষা করতে পাঠালেন। খারাপ সম্ভাবনাই সত্যি হল— লিউকেমিয়া বা চলতি কথায় রক্তের ক্যান্সার। এখন তার কেমোথেরাপি চলছে।

রক্তের সাধারণ পরীক্ষাতে যেমন রক্তকণিকার মোট সংখ্যা বা টোটাল কাউন্ট (TC), বিভিন্ন ধরনের রক্ত কোষের অনুপাত বা ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট (DC)— এসবের মধ্যে বিশেষ কোনো রোগের দিকনির্দেশ পাওয়া না গেলে তখন মজ্জা পরীক্ষার দরকার পড়ে।

- **হাড়ের মধ্যে থাকা মজ্জা হল রক্ত তৈরির কারখানা**
- **মজ্জার সামান্য অংশ হাড় ফুটো করে বাইরে এনে অণুবীক্ষণে দেখে অনেক রোগ ধরতে পারা যায়**
- **অস্থিমজ্জা পরীক্ষার পদ্ধতিটি ভীতিপ্রদ নয় এবং প্রায় সব রোগীর ক্ষেত্রেই দরকার থাকলে পরীক্ষা করা যায়, কোনো ক্ষতি হয় না**
- **সময়ে পরীক্ষাটি করলে হয়তো বা হয়তো বা বেঁচে যেতে পারে একটি জীবন**

মজ্জা বা অস্থিমজ্জা কী?

অস্থিমজ্জা বা (bone marrow) হল রক্ত তৈরির কারখানা। আমাদের দেহের অধিকাংশ হাড়ই ফাঁপা, আর সেই ফাঁপা হাড়ের ভেতরে কিছুটা জালের মতো অংশ থাকে। তাকেই বলা হয় মজ্জা। জালগুলির ধারে ধারে ফাঁপা হাড়ের ভেতরে পাতলা হাড়ের যে অসংখ্য গলিঘুঁজি আর সরু সরু তাকের মতো থাকে সেগুলির গায়ে মজ্জার আদি বা পুরানো কোষগুলি সাজানো থাকে। এই আদি কোষগুলি বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরি হয়। নতুন কোষ যেমনি বিভাজিত হতে থাকে তেমনি পরিণত হতে থাকে, পরিবর্তিত হতে থাকে। পরিণত কোষগুলি ঐ জাল অংশের ভিতর দিকে অর্থাৎ ফাঁপা হাড়ের কেন্দ্রের দিকে এসে রক্তে মেশে। এভাবেই নতুন রক্ত কোষ তৈরি হয়।

মজ্জায় রক্ত তৈরি হয় কার মাধ্যমে?

মজ্জায় বাহিত রক্ত নানা উত্তেজক (stimulus) বহন করে আনে। এই উত্তেজকদের তাগিদে রক্তের আদি কোষগুলি রক্তের নতুন, পরিণত কোষ বানাতে পারে। যদি কোনো বাজে উত্তেজক, ধরা যাক ক্যান্সারের উপাদান বা সিগন্যাল (signal) মজ্জায় আসে, তাহলে শরীরের আর পাঁচটা জায়গার মতো, মজ্জাতেও অর্থাৎ রক্তের আদি কোষগুলিতেও ক্যান্সার দেখা দিতে পারে।

কোথা থেকে মজ্জার রস নেওয়া হয়?

শৈশবে শরীরে প্রায় সব হাড়ের মজ্জা থেকেই রক্ত তৈরি হয়। তাছাড়া লিভার থেকেও মজ্জার কোষ তৈরি হতে পারে। বয়স বাড়লে নির্দিষ্ট কিছু হাড়ের মজ্জার মধ্যেই রক্ত তৈরি হয়। তাই বুকের সামনের দিকে sternum, পেছনের কশেরুকার মধ্যভাগ (vertebral body), কোমরের হাড়ের উপরের অংশ ইলিয়াক ক্রেস্ট, (iliac crest) সামনের ও পেছনের উঁচু শক্ত অংশ (যথাক্রমে anterior superior iliac spine, posterior superior iliac spine) অবশ্য দু'বছরের নীচের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পায়ের মোটা হাড় (tibia) -এর উপরের অংশ থেকেও মজ্জা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

কোমরের হাড়ের উপরের অংশের উঁচু হাড় থেকে বিশেষ ছুঁচ দিয়ে মজ্জা সংগ্রহ

এতগুলি জায়গার মধ্যে কোমরের হাড়ের পেছনের শক্ত অংশ বা (posterior superior iliac spine) অংশ সবার থেকে বেশি ব্যবহৃত হয় মজ্জা সংগ্রহের জন্য। কারণ এই অংশটি বেশ বড়ো, সামান্য চেষ্টাতেই অনেকটা পরিমাণ মজ্জা পাওয়া যায়। তাছাড়া রুগীর পক্ষে সামনাসামনি

মোটা অকারের ছুঁচ দিয়ে পরীক্ষা দেখার যে ভীতি সেটাও এড়ানো সম্ভব হয়।

কি কি ভাবে বোন ম্যারো পরীক্ষা করা হয়?

ম্যারো প্রধানত দু'রকম ভাবে পরীক্ষা করা হয়। প্রথমতঃ ছুঁচ দিয়ে সিরিঞ্জের মাধ্যমে টেনে রক্তের স্লাইড বানানোর মতো করে ম্যারো টেনে নেওয়া ও পরীক্ষা করা হয়। শিরার রক্তের মতো এক্ষেত্রেও একই ভাবে মজ্জার সঙ্গে তঞ্চন বিরোধী (anticoagulant) মিশ্রণ মিশিয়ে অন্যান্য নানারকম পরীক্ষা করতে পাঠানো হতে পারে।

দ্বিতীয় রকমটি হল, মোটা একধরনের বায়োপসি ছুঁচ যার নাম হল Trephine Needle-তাই দিয়ে মজ্জার লম্বা একটু টুকরো কেটে নিয়ে (২-৩ সেমি) বায়োপসি করা হয়। একে বলা হয় Trephine Biopsy। এই অংশটিকে অন্যান্য বায়োপসির মতোই বানানো হয় ও পরীক্ষা করা হয়।

কী কী কারণে অস্থিমজ্জা পরীক্ষা করা হয়?

প্রথমত রক্তের নানারকম ক্যান্সার নির্ণয় করতে বোন ম্যারো পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ মজ্জা শুকিয়ে গেলে, যাকে বলা হয় অ্যাপ্ল্যাস্টিক অ্যানিমিয়া— তা নির্ণয় করতে গেলেও মজ্জা পরীক্ষা দরকার। বোন ম্যারোর অন্যান্য রোগ যেমন মজ্জার কোষগুলির বিকৃতি যেমন ধরা যাক বিভিন্ন রক্তাল্পতা, বিশেষত যে ধরনের রক্তাল্পতা সাধারণ ওষুধে সারে না, সোজা ভাষায় Resistant Anemia— তাদের শ্রেণী বিভাগ করতেও মজ্জা পরীক্ষা প্রয়োজন। কিছু কিছু বাইরের ক্যান্সারও বোন ম্যারোতে বাসা বাঁধে। সেগুলিও বোন ম্যারোর পরীক্ষাতে ধরা পড়ে। এছাড়াও নানা ধরনের জীবাণু বিশেষতঃ কালাজ্বর, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ম্যালেরিয়াও অস্থিমজ্জা পরীক্ষাতে ধরা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে বোন ম্যারো পরীক্ষা করা যায় না?

অস্থিমজ্জা পরীক্ষার সাধারণ কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবে রুগীর রক্ত জমাট না বাঁধার রোগ যদি বাড়াবাড়ি রকমের হয় তাহলে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। অন্যান্য রক্ত পরীক্ষার মতো এডস, হেপাটাইটিস বি ইত্যাদি অনেক বাহকদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে বোন ম্যারো পরীক্ষা করতে হবে। এগুলির কোনোটিই পরীক্ষার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

তাছাড়া রোগীর অবস্থা যদি খুব খারাপ হয় যেমন শক ইত্যাদি, তাহলে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে বোন ম্যারো সংগ্রহ করতে হবে। সাধারভাবে বোন ম্যারো সংগ্রহ করতে গেলে রোগীর হাত পা ঝিমঝিম করা, অত্যধিক যন্ত্রণা হওয়া, এমনকি মৃগী রোগের ক্ষেত্রে অজ্ঞান হওয়ার ঘটনা বা খিঁচুনি (convulsion) হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এই ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য বিরল ক্ষেত্রে ম্যারোতে ছুঁচের অগ্রভাগ আটকে যাওয়া, ম্যারো অংশ

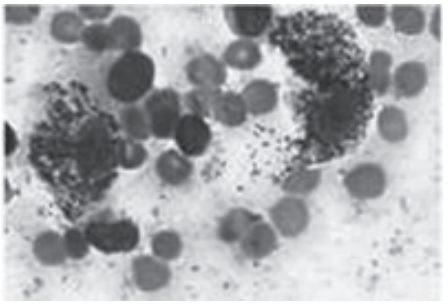

অণুবীক্ষণের তলায় মজ্জা যেমন দেখায়

পেরিয়ে ভিতরের অঙ্গের ক্ষতি হওয়া, বিশেষত- বুকের সামনের অংশের হাড় sternum যার পেছনে থাকে হার্ট ও তার আচ্ছাদন অর্থাৎ pericardium তার ক্ষতি হতে পারে।

Multiple myeloma রোগে হাড় ক্ষয়ে যায়। কখনো কখনো ছুঁচ হাড়ের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেলেও বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রেও ছুঁচ হাড় ভেদ করে চলে যেতে পারে শরীরের ভেতরে।

শেষ কথা :

এই কথা শেষ হওয়ার নয়। তবু আলোচনার শেষে জানাই পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াও বোন ম্যারোর সবিশেষ প্রয়োজন প্রতিস্থাপন বা transplantation করবার জন্য। এবিষয়ে পরে কোনো একদিন বলব। এছাড়াও মজ্জার মাধ্যমে কিছু ক্যান্সারের বিশেষতঃ রক্তের ক্যান্সারের ওষুধ দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে ওষুধের ডোজ বা মাত্রা শিরার মধ্যে দিয়ে যে ডোজে দেওয়া হয় তার পঞ্চাশ ভাগ থেকে একশ ভাগের একভাগ মাত্র। ফলে অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেকটা এড়ানো সম্ভব হয়।

লেখক পরিচিতিঃ ডাঃ দেবাশিস চক্রবর্ত্তী, এম বি বি এস, ডি সি পি, এম ডি, একজন বিশেষজ্ঞ প্যাথোলজিস্ট। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের একটি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন।

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

স্মরণে

কাদম্বিনী বসু থেকে ডক্টর গাঙ্গুলি

প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে নিয়ে লিখেছেন সোমা মুখোপাধ্যায়।

উনিশ শতকের সমাজ তাকে দেখেছিল অপার বিস্ময়ে। কেননা সেদিন বঙ্গ ললনাদের কাছে যা ছিল কল্পনারও অতীত তিনি সেই কল্পনার রথকে শুধু বাস্তবের টাট্টু ঘোড়া টানা ফিটনেই রূপ দেন নি- তাতে সওয়ার হয়ে এই শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রোগী দেখে বেড়িয়েছেন। তিনি ডক্টর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক। চিকিৎসকের পেশাকে জীবিকা নির্বাচন করতে গিয়ে যিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন এক ইতিহাস। তাঁর জন্ম ১৮৬১ সালে ভাগলপুরে।

কাদম্বিনীর পিতা ব্রজকিশোর অধুনা পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার চাদসি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় শিক্ষক পিতার অনুপ্রেরণায় কাদম্বিনী চোদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় 'হিন্দু বিদ্যালয়' এ ভর্তি হন যা পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের একমাত্র পুরুষ শিক্ষক। পরবর্তীতে তিনি অসম্ভব এই মেধাবী ছাত্রীটিকে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন। উনিশ শতকের বাঙলায় আলোকপ্রাপ্তা ব্রাহ্ম পরিবারের অন্যতমা সদস্যা কাদম্বিনী। একদিকে তিনি ব্রজকিশোর বসুর কন্যা যে ব্রজকিশোর প্রথম 'মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে তিনি অবলাবান্ধব সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। আত্মীয়তার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ এবং তাঁর বন্ধু ঠাকুর পরিবারের সরলা দেবী চৌধুরানী। তবুও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে জেহাদ ঘোষণা করতে হয়েছে সময় আর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

নিয়ম ভাঙার এই লড়াইয়ের সূত্রপাত ১৮৮০ সালে- সে বছরই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরীক্ষার ফলাফলই তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা প্রমাণ করে। ইতিহাস আর বাংলার পাশাপাশি বিজ্ঞানে তাঁর ভালো নম্বরের উল্লেখ করে সেনেটে বক্তব্য রেখেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ব্রিটিশ ভাইস চ্যান্সেলর। এহেন বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্রীর পক্ষে চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করাটা তো যথেষ্ট যুক্তিসংগত। কিন্তু তদানীন্তন ব্যবস্থায় তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর হল। এমনটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল সেই সময়ে কেননা চিরাচরিত ধারণায় 'মেয়েরা অসুখ করাতে পারে, সারাতে পারে না।' এদেশের শিক্ষাদপ্তর

কিন্তু মেয়েদের মেডিকেল পড়ার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। কিন্তু সূক্ষ্ম আপত্তিও যে ছিল মেডিকেল কাউন্সিলের তা স্পষ্ট বোঝা যায় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কোটসের প্রশ্নে কাউন্সিল যে উত্তর দিয়েছিল তার মাধ্যমে। অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে মেয়েদের মেডিকেল পড়ানো উচিৎ নয় এমনটাই তাঁরা বলেছিলেন। আর যদি একান্তই তা পড়াতে হয় তাহলে ছেলেদের থেকে পৃথক ভাবে পড়াতে হবে এবং ধাত্রীবিদ্যার উপর জোর দিতে হবে। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের উদাহরণ দিয়ে কোটস্ এ বিষয়টির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন মাদ্রাজে যা সম্ভব কলকাতায় তা হবে না কেন?

শিক্ষা বিভাগের এই গড়িমসিতে আর সময় নষ্ট না করে আগেই বি. এ. পড়তে শুরু করেছিলেন কাদম্বিনী। ১৮৮২ সালে তিনি ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেন। তাঁর পাশে সহায় স্বরূপ সাহায্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন প্রিন্সিপাল কোটস্। তাঁর উদ্যোগে অবশেষে এ. পি. ম্যাকডোনেল একটি আইন প্রনয়ণ করেন যার ফলস্বরূপ কলকাতা মেডিকেল কলেজে মহিলাদের চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়নের পথটি উন্মুক্ত হয়ে যায়।

অবশেষে ১৮৮৩ সালের জুন মাসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন কাদম্বিনী। এর কিছুদিন আগেই তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন বিপত্নীক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে। সহধর্মিনীকে সহমর্মিতার সঙ্গেই উপলব্ধি করেছিলেন তিনি- তাই সেকথা অকপটে প্রকাশিত হয়েছিল, 'নারীগণ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা না করিলে নারীজাতিসুলভ নানা প্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারিবে না এবং নারীজাতির স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত হইবে না এজন্য তিনি সর্বপ্রথম আপনার পত্নীকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়াছিলেন।'

কাদম্বিনী কোনো ডায়রি লেখেন নি। তাই একথা অস্বীকার করে লাভ নেই মেডিকেল পড়ার বিষয়ে দ্বারকানাথের অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁর পাথেয় হয়েছিল। অবশ্য তাঁর নিজের জোরদার ইচ্ছেও ছিল। না হলে এতটা পথ তিনি অতিক্রম করলেন কীভাবে? ১৮৮৩ সালের জুন মাসে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ১ মাস পরেই ২.৭.১৮৮৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে মহিলা ছাত্রীদের একসঙ্গে অধ্যয়নের কী কী অসুবিধা তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিল যার মধ্যে মোক্ষম অস্ত্রটি বর্ষিত হয়েছিল এইভাবে - '... আরও অন্যান্য আপত্তির মধ্যে উক্ত কলেজের একদল ছাত্র বলেন যে, নিয়ম আছে সমস্ত বক্তৃতাতে উপস্থিত না থাকিলে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এবং যদি এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে যদি কোনো রমণীর গর্ভ হয়, তবে প্রসবকালীন তিনি কী করিয়া বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিবেন? আপত্তি কয়েকটি যুক্তিসংগত।'

কিন্তু এমনটা কি সত্যিই প্রযোজ্য হয়েছিল কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে? এক ভারতীয় বন্ধুকে লেখা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পত্র থেকে যা প্রমাণিত হয় তা হল সন্তান জন্মের পর কাদম্বিনী ছুটি নিয়েছিলেন

মাত্র ১৩ দিন আর একটাও লেকচার মিস করেন নি। ফার্স্ট লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি পাশ করে ফাইনালের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু কাদম্বিনীর পড়ার কথা তো এম. বি- এল. এম. এস নয়। আসলে বিলেত ফেরত চিকিৎসক রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র প্রথম থেকেই বিরোধী ছিলেন মহিলাদের মেডিকেল পড়ায়। তাই তাঁর কাছে কাদম্বিনী প্রাকটিক্যালে ফেল করলেন মাত্র ১ নম্বরের জন্য। কিন্তু এল. এম. এস. পড়তে গিয়েও তো স্বস্তি নেই। সেখানেও একই পরীক্ষক আবার ফেল করালেন তাঁকে। সেনেটের অনুরোধে পুনর্মূল্যায়ণ হল বটে কিন্তু পাশ করলেন না কাদম্বিনী। অবশেষে অধ্যক্ষ কোটসের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে 'গ্রাজুয়েট অব দ্য মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল' উপাধি নিয়ে ডাক্তারি প্রাকটিস করার লাইসেন্স পেলেন। যোগ দিলেন ইডেন হাসপাতালে। সেখানে অবশ্য তাঁর মর্যাদা ছিল ধাত্রীর সমতুল্য। ১৮৯০ সালে তিনি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনের চাকরি পান। সে যুগে তাঁর মতো উচ্চ হারে বেতন খুব কম বাঙালী পুরুষেরাই পেতেন। তাহলে কী এটাই কাদম্বিনীর লড়াইয়ের আসল উৎস? প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জটিল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি?

কাদম্বিনী যে একজন নামকরা চিকিৎসক হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ সমসাময়িক পত্রিকায় দেওয়া তাঁর বিজ্ঞাপনগুলি। এগুলোর ভাষার পরিবর্তন থেকে উপলব্ধি করা যায় পসার ও খ্যাতির আলোয় আলোকিত হচ্ছিলেন তিনি। বেনিয়াটোলা লেনের চেম্বারে প্রাকটিসরত যে কাদম্বিনী ১৮৮৮ সালে বেঙ্গলি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছিলেন গরিবদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে তিনিই তিন বছর পরে নিজের বসতবাড়ি সুকিয়া স্ট্রীটে উঠে যাওয়ার পর বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলে বিনামূল্যে পরিষেবার খবরটি পরিহার করেছেন। এই সময় আর কোনো মহিলা চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে আসে না।

কাদম্বিনীর এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কারণেই বোধহয় বঙ্গবাসী পত্রিকাগোষ্ঠী তাঁকে চরিত্রহীনা বলে কটূক্তি করেছেন। অবশ্যই তার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি - তিনি বঙ্গবাসী গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বঙ্গনিবাসীর সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। মামলায় দ্বারকানাথ জয়ী হন এবং মহেশচন্দ্র পালের ১০০ টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের কারাদন্ড হয়। এই মামলা শুধু কাদম্বিনী নয় সমগ্র নারী জাতির অপমানের বিরুদ্ধে যেন এক প্রতিবাদ ছিল।

১৮৯৩ সালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ ডিগ্রীর আশায় ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন কাদম্বিনী। মাত্র সাড়ে তিন মাস ক্লাস করে এডিনবরা থেকে এল.আর. সি. পি. উপাধি পেয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এরপর সহজেই লেডি ডাফরিন হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তারের প্রার্থিত পদটি তিনি লাভ করেন। কিন্তু এতদিনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হাসপাতালে চাকরি করলে দেশীয় মহিলাদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে ব্যক্তিগত ভাবে প্রাকটিস শুরু করেন।

প্রতিটি মেডিকেল ছাত্রীর প্রকৃতিদত্ত কী কী স্বাভাবিক গুণ থাকা উচিৎ তা জানা যায় লেডি ডাফরিনের ধারণা থেকে, The health of a medical student should be sound she should have no personal disfigurement; she should have a good temper, and should not be of a nervous temperment; She should be intellegent; and she should be of such a position as to be generaly acceptable to the persons she is intended to serve। বলা বাহুল্য এসবই কাদম্বিনীর ছিল। লীলা মজুমদারের বিবরণী এর সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। তিনি কাদম্বিনীকে দেখেছিলেন ১৯২০ সালে তাঁর জীবনের শেষ দিকে। তাঁর ভাষায়, ''তাঁর জীবনটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমি যে সময়ের কথা বলছি তার অনেক আগেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। বয়সে জ্যাঠাইমার (দ্বারকানাথের প্রথম কন্যা বিধুমুখী) চাইতে সামান্য বড় ছিলেন। দেখে মনে হত অনেক ছোট। মস্ত দশাসই চেহারা, ফুট ফুট করত গায়ের রং, থান পরে এবং এত বয়সেও রূপ চাপা পড়ত না, তবে কেমন একটু কড়া কড়া ধরনের ভাব। আমরা দূর থেকে দেখতাম, তিনিও কাছে ডাকতেন না।"

পেশায় চিকিৎসক কাদম্বিনী ছিলেন নয়টি সন্তানের জননী এবং পুরোমাত্রায় সংসারি। ঘর ও বাহির মিলিয়েছেন সমানতালে। তিনি অংশ নিয়েছিলেন জাতীয় আন্দোলনেও। ১৮৮৯ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন ও তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা প্রতিনিধি যিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি একাধারে অনেক জনহিতকর কাজ করেছিলেন এবং নারী আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন, মেয়েদের শিল্পকলা সংগ্রহ করে মার্কিন দেশের প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছেন, দাপটের সঙ্গে প্রাকটিস করেছেন নীলরতন সরকারের মতো চিকিৎসকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। জীবনের শেষ দিনটিতেও তিনি সম্পন্ন করেছিলেন জটিল এক অপারেশন। এর বিনিময়ে পাওয়া ৫০ টাকা পারিশ্রমিকে তাঁর সৎকার হয় বলে কথিত আছে।

তবু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। এতকিছুর পরও আজ কেন এক অবগুন্ঠিতার মতোই অন্তরালে থেকে যাবেন তিনি? চিকিৎসা ও সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর সে অবদান তো সমকালীন কোনো প্রথিতযশা বাঙালী নারীর চেয়ে কম নয়। তবু কেন এত অনাদর? কেন তাঁর সার্দ্ধ শতবর্ষে নামমাত্র কয়েকটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুধু অসাড় কিছু বক্তৃতা আর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছি আমরা? কেন তাঁর জীবন যে নিয়ে আরও অন্বেষণ ও গবেষণায় উৎসাহী নয় কেউ? এত কেন' র কি কোনো উত্তর মিলবে না সুধীজনেক কাছ থেকে?

তথ্য সূত্রঃ

১. চিত্রা দেব -মহিলা ডাক্তার - ভিন গ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ, ১৯৯৪
২. স্বাতী ভট্টাচার্য - ডক্টর গাঙ্গুলি -রবিবাসরীয়, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

লেখক পরিচিতি : সোমা মুখোপাধ্যায় ইতিহাসে পি. এইচ. ডি.। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের কর্মী। তাঁর গবেষণার বিষয় 'বাংলার দাই'।

স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার

ডা. বিনায়ক সেন

মানবাধিকার হল সেইসব ন্যূনতম অধিকার যা রাষ্ট্র বা জনকর্তৃত্বের কাছ থেকে মানুষের অর্জন করা উচিত, অন্য কোনো শর্ত ছাড়াই, শুধুমাত্র মানবসমাজের একজন সদস্য হবার সুবাদে। মানবাধিকারের ধারণাটি গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অর্জিত মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের সুপ্রাচীন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। রাজনৈতিক সমাজে সভ্যজীবনের অভ্যুদয়ের সূচনা থেকেই শাসকশক্তির অন্যায় ও অত্যাচার মানুষকে বাধ্য করেছে উচ্চ আইনের সাহায্য নিতে। তখন থেকেই জন-কর্তৃপক্ষকে সংযত করার জন্য উচ্চতর আইন প্রণয়ণের ধারণা গড়ে উঠেছিল। তখন থেকেই জোর দেওয়া হয়েছিল সামাজিক নির্দিষ্ট কিছু অধিকারের উপর। জন-কর্তৃপক্ষ সৃষ্ট অধিকারের চেয়ে এই আইনসমূহ অনেক বলিষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবীর সকল বয়সের, সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মনে করা হয় যে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে উঠবার আগে থেকেই এই আইনগুলি বলবৎ ছিল।

আধুনিক সমাজে ব্যাধির মূলেই রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ, যেগুলি মানুষের চিরকালীন দুর্ভোগের উৎস, সেগুলি জন নীতিরই ফলশ্রুতি- অধিকাংশই ঘটে রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কয়েক দশক মানবাধিকারের আইনানুগ বিধিবদ্ধতার স্বীকৃতি সারা বিশ্বের মেহনতী মানবগোষ্ঠীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ- নিরপেক্ষ মানবতাবাদের জন্যও তা অত্যন্ত জরুরী।

''প্রত্যেকেরই তেমন জীবনযাত্রার মান অর্জন

করবার অধিকার আছে যা তাঁর ও তাঁর পরিবারের স্বাস্থ্য ও ভালো থাকার জন্য পর্যাপ্ত, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা পরিষেবা যার অর্ন্তভূক্ত...''

পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র, যাতে ভারতবর্ষও সম্মতিস্বাক্ষর করেছে, তার ১২ (ক) পরিচ্ছদে বলা হয়েছে- ''এই সামগ্রিক চুক্তিপত্রে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে প্রত্যেকেরই যতদূর সম্ভব উন্নতমানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করার অধিকার আছে।''

সেই একই বছরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে যখন বিশ্ব-ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী নীতির একজন উল্লেখযোগ্য প্রণেতা জন কেনন্ বলেন, ''বিশ্বের সমগ্র ধনসম্পদের ৫০ শতাংশ আমাদের করায়ত্ত কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৬.৩ শতাংশ। এই অবস্থায় আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হল পারস্পরিক সম্পর্কের এক ছক নির্মাণ যাতে আমরা আমাদের এই অসম অবস্থাটা জারি রাখতে সক্ষম হই। এটা অর্জন করতে হলে আমাদের সর্বপ্রকার স্পর্শকাতরতা বিসর্জন দিতে হবে- মানবাধিকার, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা ত্যাগ করতে হবে।''

দুইটি তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির আঁতাতের মধ্যে সন্ধান করতে হবে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমীকরণ তাদের দুর্ভোগেরই সৃষ্টি করে। কীভাবে রাজ্যনীতি কাজ করে তার কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হল—

খাদ্যঃ

একথা সকলেরই ভালোভাবে জানা আছে যে বয়স ও ওজনের আনুপাতিক আন্তর্জাতিক হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের ৪০ শতাংশই অপুষ্টির শিকার। নির্ভরযোগ্য সমীক্ষার পরিসংখ্যানে বারবারই এই তথ্য উঠেছে। কিন্তু যা ততটা জানা নেই তা হল যে দেহভর অনুযায়ী ৩৫ শতাংশ ভারতীয় নারী, পুরুষ উভয়েই অপুষ্টির শিকার। তাদের গড় দেহভর ১৮.৫ শতাংশের নীচে। দেহভর সূচক ঠিক হয় শরীরের ওজন (কি গ্রা) ও উচ্চতার (মিটার) বর্গের অনুপাত দিয়ে। জাতীয় পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এন এন এম বি) পরিচালিত সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই তথ্য পাওয়া গেছে। এই তথ্য আমাদের জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ সুস্থতার উপর সুদীর্ঘ কুপ্রভাব বিস্তার করবে। আর দুঃখের কথা হল এই যে এটা ঘটছে সেই সময়ে যখন আমাদের শস্যভান্ডার এতটাই পর্যাপ্ত যে তা সংরক্ষণই এক বিশাল সমস্যা হয়ে উঠেছে।

জল ঃ

এ বছর বর্ষার শুরুতেই রায়পুরে আন্ত্রিক রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। রায়পুর হল ছত্তিশগড়ের রাজধানী। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে দিল্লিতেও একই পরিস্থিতি বিরাজমান। এই শহরের দরিদ্রতর এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পানযোগ্য জল সরবরাহের একান্ত অভাব, যার জন্য দায়ী মিউনিসিপ্যালিটির সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। একইসঙ্গে দুর্গের কাছে শেওনাথ নদীর বেসরকারিকরণের ফলে, তার উপকূলে গড়ে ওঠা বৃহৎ শহরাঞ্চলের ভবিষ্যৎ জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে চলেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাঃ

ভোর (Bhore) কমিটিতে ও আলমা আটায়, ভারতীয় নাগরিকগণ যথাযথ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার অঙ্গীকার করেছিলেন। পরিবার পরিকল্পনা ও টীকাকরণ ব্যতিরেকে ছত্তিশগড়ের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বাস্তবে কার্যত অস্তিত্বহীন। ম্যালেরিয়া রোগের

স্লাইড প্রস্তুতের মতো ল্যাবরেটরি পরিষেবাটুকুও নেই। এ এন এম-দের কাছে স্লাইড তৈরির জন্য জীবাণুমুক্ত ও পরিত্যজ্য ছুঁচের জোগান নেই। তাঁরা ব্যবহৃত ছুঁচ না ফুটিয়েই আবার ব্যবহার করছেন। AIDS প্রতিরোধের জন্য কী চমৎকারই না ব্যবস্থা!

এছাড়া যক্ষ্মা প্রতিরোধ প্রকল্পে রোগীদের চিকিৎসা চলছে অনিয়মিত ভাবে এবং তাদের ওষুধের মাত্রাও অপর্যাপ্ত। মাল্টি ড্রাগ প্রতিরোধী যক্ষ্মার মহামারী আকারে দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে শিরে সংক্রান্তির মতো। পরিষেবা গ্রাহকদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক ধার্য করবার ফলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিষেবা ব্যবস্থা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে— প্রতিপত্তি বাড়ছে প্রাইভেট চিকিৎসক ও পার্শ্ব চিকিৎসকদের। ছত্তিশগড়ের গোষ্ঠী স্বাস্থ্যকর্মিদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োজনের প্রকল্প যদিও সাধুবাদের যোগ্য তথাপি তা সরকারি

চিকিৎসা পরিষেবার প্রসার হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। বরং তাকে দেখা উচিত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পিত উদ্যোগের সূত্রপাত হিসাবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে গঠনগত পরিবর্তনের প্রকল্পটির ক্ষমতা অর্জন করা উচিত, প্রথম প্রকল্পটির পরিপূরক হয়ে ওঠবার জন্য। নির্দিষ্ট চিকিৎসা বিধিগুলি হবে প্রয়োজনীয় জরুরী দলিল যার ভিত্তিতে এই উদ্যোগ সুস্পষ্টভাবে মূল্যায়িত হয়ে উঠবে। ‘পেসা’ র বিস্তৃতিকরণ আইনের সঙ্গে কার্যকরী অর্থনৈতিক হস্তান্তর, জনগণকে আইন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করবে, পুনর্গঠিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে। ‘স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার’-এই স্লোগান নতুন কিছু নয়, মানবাধিকারের দলিলে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ভারতও একজন স্বাক্ষরকারী। এই অবস্থায় মেহনতী মানুষদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই স্লোগান আরও অর্থবহ হওয়া দরকার, তাঁদের ও তাঁদের সন্তান সন্ততিদের স্বাস্থ্যকর ও সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য।

লেখক পরিচিতিঃ **ডা. বিনায়ক সেন** বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মানবাধিকার কর্মী। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করায় ছত্তিশগড় সরকারের মিথ্যা মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

অনুবাদক ডা. ইলা লাহিড়ী ও ডা. জয়ন্ত লাহিড়ী পেশায় চিকিৎসক। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হিসাবে তাঁদের নাম সুপরিচিত। উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্মের মধ্যে দুটি হল ‘গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও আমার জীবন’ (লেখক মহম্মদ ইউনুস, প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স) ও ‘উন্নয়নের উৎস সন্ধানে’ (বাউলমন প্রকাশন)।

- **স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ**
- **বাণিজ্যিক নয়— মানবিক**

ফুকুশিমার পাশে ‘লাইতেত’ গ্রাম-এর কাহিনী

পরমাণু বোমা ব্যাপারটা যে খুব খারাপ সেটা সবাই জানেন। কিন্তু পরমাণু চুল্লি কি নিরাপদ? অনেকের ধারণা বিশ্ব উষ্ণায়ণের মোকাবিলা করতে আমাদের আরও বেশি করে পরমাণু চুল্লি তৈরি করা উচিত; ভারত সরকার সেই পথেই এগোচ্ছেন। তবে ২০১১-র মার্চ মাসে জাপানে ফুকুশিমায় পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনা ঘটার পর বোঝা গেছে যে পরমাণু চুল্লি মোটেই নিরাপদ নয়। তা নিয়ে বহু লেখাপত্র বহু পত্রিকায় বেরিয়েছে। অনেক দেশ তাদের পরমাণু চুল্লি গড়ার পরিকল্পনা খারিজ করেছে, ভারত অবশ্য তা করে নি। পরমাণু চুল্লির তেজস্ক্রিয় বিকিরণে মানুষের স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে স্বাস্থ্যের বৃত্তে আগেই কিছুটা লেখা হয়েছে। ফুকুশিমার পরমাণু চুল্লি থেকে বেশ দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম তাৎক্ষণিক ভাবে কতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এই সংখ্যায় তার মানবিক কাহিনী লিখেছেন **প্রদীপ দত্ত**।

গত ১১ মার্চ, ২০১১, জাপানের ফুকুশিমার দাইচি পরমাণু কেন্দ্রে ঘটে গিয়েছে মর্মান্তিক বিপর্যয়। তিনটি পরমাণু চুল্লির অন্তস্তল গলে গিয়েছে। সেই থেকে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় কণা ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছে, বন্ধ হয়েছে ডিসেম্বর মাসে। প্রশান্ত মহাসাগর সহ দু'পারের বিপুল এলাকা তেজস্ক্রিয় দূষণে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার বিলম্বিত প্রভাব ঠিক কতটা মর্মান্তিক তা বুঝতে ও জানতে আমাদের আরও বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

লক্ষাধিক মানুষকে ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হয়েছে। নিজের বাসস্থান ছেড়ে চলে যাওয়ায় সমস্যাটি ঠিক কী রকম ছিল তা লাইতেত গ্রামের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছুটা বোঝা যাবে। ১৫ মার্চ ২০১১ ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু কেন্দ্রের ৩ নম্বর চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেদিন বিকেল থেকে আবহাওয়া বদলে যায়। এতদিন পরমাণু কেন্দ্র থেকে সমুদ্রের দিকে বাতাস বইছিল। এবার তা উত্তর-পূর্ব দিকে ‘করিডোর অব উইন্ড’ ধরে বইতে শুরু করল।

দাইচি পরমাণু কেন্দ্রের ২৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকের এক পাহাড়ি গ্রামের নাম লাইতেত। ৩২৮০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই গ্রামটি পাইন, সেডার ও ফার বন দিয়ে ঘেরা। গ্রীষ্মকালে এখানে যাঁরা ট্রেকিং করতে আসেন তাঁরা লেকের ধারে টেন্ট খাটিয়ে থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে লাইতেতে তুষারপাত শুরু হয়। পরের দিন সকালে বাসিন্দারা দেখলেন ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সবুজ ঘাস, বনের গাছপালা সাদা বরফে ঢাকা পড়েছে। জাপানে তখন শীতের শেষ সময়। এলাকার মানুষ বেলচায় করে বরফ সরাতে নেমে পড়লেন।

টোকিও*র খবর ছিল অপসারিত এলাকার বাইরে এই স্থানে যে তুষারপাত হয়েছে তা* তেজস্ক্রিয়। কিন্তু সরকার সে কথা জানাল এক সপ্তাহ পরে। ততদিন ছ'হাজার মানুষের এই গ্রাম তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। সরকার কিন্তু বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করে নি।

সেখানকার গুটিকয়েক তরুণ এই দূষণ নিয়ে ইন্টারনেটে চ্যাট করছিল, ক্রমেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মার্চের শেষে যুবক কেন্তা সাতো টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলে, স্মার্ট ফোন থেকে কয়েকশো বার্তা পাঠালেন। প্রায় ছ'হাজার জন তাতে সাড়া দেন, কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্যও ছিলেন। ২৬ মার্চ কেন্তা সাতো লিখলেন- ক্রমাগত উঁচুমাত্রার তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকার পরও সরকার এখানকার মানুষকে অপসারণের কথা বলছে না। এমন জায়গায় বসে আমি কাজ করছি যা সারাদিন ধরে আরও তেজস্ক্রিয় হয়েই চলেছে, প্লিজ হেল্প।

চুল্লির কাছাকাছি অতি তেজস্ক্রিয় অঞ্চলের মানুষকে অপসারণের জন্য নির্দেশ দিতে সরকারকে ভাবতে হয় নি। কিন্তু লাইতেতে বসবাস করা যে খুবই বিপজ্জনক সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এক মাসের বেশি সময় লাগল। ততদিনে অনেকের কাছেই, বিশেষ করে বয়স্কদের কাছে, সাবধানতার গুরুত্ব কমে গিয়েছিল।

তেজস্ক্রিয় দূষণের ক্ষেত্রে করণীয় কী তা নিয়ে জাপানজুড়ে চলছিল বিভ্রান্তি। সরকারি কর্তাব্যক্তিরা কোথায় থাকা যায়, কী খাওয়া যায়, কীভাবে কৃষকরা চাষের জমি তেজস্ক্রিয়তামুক্ত করবেন তা ঠিক করতে ব্যস্ত। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তার জন্য অপসারিত মানুষের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৬ হাজার। তাঁদের ঘরে ফেরা চলবে না। তারপরও সরকার নতুন নতুন অঞ্চলের মানুষকে অপসারণের কথা বলেছে। মার্চ মাসেই চুল্লি থেকে ২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাসকারীদের অপসারণ করেছে। ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ঘরের মধ্যে থাকতে বলেছে। প্রথম কয়েকদিন লাইতেতের মতো কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য ভালো ছিল,

বাতাসবাহিত তেজস্ক্রিয়তা সেখানে পৌঁছায় নি।

১৫ মার্চ বিকেল থেকে অবস্থা বদলে গেল। টোকিওর সরকারি কম্পিউটার ব্যবস্থা (স্পিডি) তখন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কোথায় কতটা ছড়াচ্ছে তার পূর্বাভাসের কাজে ব্যস্ত। তারা জানাল, বাতাসবাহিত তেজস্ক্রিয়তা লাইতেতের দিকে এগোচ্ছে।

পরের দিন শিল্প ও বিজ্ঞান মন্ত্রক (পরমাণু গবেষণা এর অধীন) লাইতেতের দক্ষিণের বসতি নাগাড়রোতে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের জন্য একদল কর্মী পাঠাল। তারপর দেশের নানা স্থান থেকে আরও কয়েকটি দল চলে এল। গাড়ির মাথায় রেডিয়েশন সেন্সার লাগিয়ে তারা লাইতেতের চারপাশে ৩৬টি অঞ্চলের বিকিরণ মাপল।

এরপর ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকার সাধারণ মানুষকে তেজস্ক্রিয়তার তথ্য সরবরাহ করা শুরু করে। তবে মানুষ কী সাবধানতা নেবে সে সম্বন্ধে কিছু বলল না। কেন্তা সাতো তেজস্ক্রিয় দূষণ এড়াতে দূরে মায়ের কাছে থাকতে গেলেন। ওদিকে ২১ মার্চ তাঁর বাবা কারখানা ফের চালু করার তাগিদে ছেলে সহ ছ'জন কর্মচারীকে কাজে যোগ দিতে বললেন। সাতো মরিয়া হয়ে টুইটারে লাইতেতের মানুষকে অপসারণের জন্য সরকারের ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করলেন।

১৭ ও১৮ মার্চই লাইতেতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছিল সবচেয়ে বেশি। সে সময় প্রধানমন্ত্রী নাওতো কানের বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন তোশিসো কোসাকো। তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত সংকট মোকাবিলায় সরকারের অবহেলার প্রতিবাদে এপ্রিল মাসের শেষে তিনি পদত্যাগ করেন। ২২ মার্চ তিনি কান ক্যাবিনেটের কাছে লাইতেতের কিছু কিছু অংশ ও আশপাশের এলাকাকে উঁচুমাত্রার তেজস্ক্রিয় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে বলেন। সরকারি কর্তাদের কাছে পাঠানো এক ডকুমেন্টে তিনি লেখেন— তেজস্ক্রিয়তার ওপর নজরদারি জোরদার করা দরকার, শিশুদের থাইরয়েড ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে। দু'দিন পরে আর এক চিঠিতে তিনি ওইসব অঞ্চলকে অপসারিত এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলেন। কিন্তু সরকার নড়েচড়ে না বসে কেবল দাবি করে যে, নজরদারি জোরদার করেছে। এরপর কোসাকো পদত্যাগ করেন।

সে সময় নিউক্লিয়ার সেফটি কমিশনের প্রধান হারুকি মাদারেম জানান যে, তাঁরা জানেন অপসারিত এলাকার বাইরেও দূষিত এলাকা রয়েছে, তবে তাতে মানুষের স্বাস্থ্যে কোনো কুফল দেখা দেবে না।

ওদিকে সাতোর বাবা একদিন সকালে বসন্তের বাতাস উপভোগ করতে জানালা খুলে দিলেন। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে ছেলের বাকবিতন্ডা চলল। ছেলে ততদিনে তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র কিনে ফেলেছে। বাবা পরে বলেন, যুবক-যুবতীরা কেন উদ্বিগ্ন তা আমি বুঝি। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তায় ক্যান্সার হোক কি না হোক ২০/৩০ বছরের মধ্যে আমি মারা যাব। কাজেই কারখানা ছেড়ে চলে যেতে পারবো না। এমন বড়সড়ো কারখানা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার সুযোগও নেই।

২৮ মার্চ কিওটো ইউনিভার্সিটির রিসার্চ

রিঅ্যাক্টর ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তেতসুজি ইমানাকার নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ লাইতেতের বাতাস, জল, মাটি পরীক্ষা করতে আসেন। তাঁরা ১৫০টি স্থানের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাপ নিলেন। এক জায়গায় তা এত বেশি ছিল যে, মানুষ এক বছরে ১৬০ মিলিসিয়েভার্টস বিকিরণের শিকার হবেন। সরকারি পরিমাপের সঙ্গে তাঁর পরিমাপের মিল ছিল না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর পরিমাপ ছিল আড়াই গুণ বেশি। লাইতেত ছেড়ে যাওয়ার আগে ইমানাকা গ্রামের প্রধান নোরিও কান্নোকে অবিলম্বে শিশুদের সেখান থেকে অপসারণের কথা বলেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল দূষিত মাটির ওপরের স্তর তুলে ফেলে কত তাড়াতাড়ি চাষবাস করা যায় সে বিষয়ে প্রধানের বেশি আগ্রহ। ৩০ মার্চ আই এ ই এ জানায়, নমুনা মাটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাটি এতটাই তেজস্ক্রিয় যে মানুষকে অপসারণ করতেই হবে।

সময় যত গড়িয়েছে বয়স্ক মানুষকে অপসারণের জন্য রাজি করানো কঠিন হয়েছে। ৯ এপ্রিল সরকারি কর্তৃপক্ষকে লেখা এক চিঠিতে কান্নো অভিযোগ করেন যে, গ্রামের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই সরকার লাইতেতের দূষণ সংবাদ প্রকাশ করেছে বলে বাসিন্দাদের ওপর অপরিসীম মানসিক চাপ ও যন্ত্রণা তৈরি হয়েছে।

যুবকদের অভিযোগ, যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছে তাঁদের বয়স ষাট-সত্তরের কোঠায়, তাঁরা গ্রাম ছেড়ে যেতে চান না। তাঁরা যাচ্ছেন না বলে ছেলেমেয়েরা তাঁদের ছেড়ে যেতে পারছেন না। এই অবস্থায় বয়স্করা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ২২ এপ্রিল টোকিও থেকে নির্দেশ এল, লাইতেত ও অন্য চারটি মিউনিসিপালিটির উঁচুমাত্রার তেজস্ক্রিয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের অপসারণ করা হবে। স্থানীয় কৃষক ও কারিগরদের কাছে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার ক্ষতির কোনও তুলনা হয় না। জীবনে যেন বেঁচে থাকার জন্য কোনও রসদই রইল না। ফুকুশিমার বিপর্যয়ের আগে লাইতেতে ছিলেন ৬-৭ হাজার মানুষ, মে মাসের গোড়ায় সংখ্যাটা কমে দাঁড়ালো ৪ হাজার। গ্রামের গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের প্রথমে অপসারণ করা হয়েছে। তারপর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। আশা, যেসব পরিবারে শিশু রয়েছে তাঁরা দ্রুত এলাকা ছেড়ে যাবেন। বাকিরা জুন মাসের শেষে। এখানেই তাঁদের জন্ম হয়েছে, এখানেই তাঁদের ঘর, অথচ এখানে যে ফিরে আসতে পারবেন সে ভরসা নেই।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সেখানে এক নার্সিং হোমে বাস করছিলেন এলাকার ১৮০ জন বয়স্ক বাসিন্দা। তবে কান্তো সাতোর বাবা-মায়ের মতো আরও দশ জন নিষেধাজ্ঞা না-মেনে গ্রামেই রয়ে গেছেন।

মিয়োকো ওকুবোর দুঃখ, আগে কেন খেয়াল করেন নি। একটু যদি খেয়াল করতেন, তাহলে তার শ্বশুরমশাই ফুমিয়ো ওকুবো আজও বেঁচে থাকতেন। টেবিলে বসে কথা বলার সময় ফুমিয়ো দরজার বাইরে ধানখেতের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে থাকতেন। এপ্রিলে যখন এন এইচ কে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক থেকে বলা হল, লাইতেতের মানুষকে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে, ফুমিয়ো জিজ্ঞাসা করেন, সত্যি নাকি?

মিয়োকো বলেন, ওরা তো তাই বলছে। এখন ভাবেন, ফুমিয়োর কাছে ঐ প্রশ্নটির কত বড়ো গুরুত্ব ছিল! ছোট ছোট বিষয় আগে খেয়াল করেননি বলে, এখন আক্ষেপের শেষ নেই। শ্বশুরমশাই সারাদিন ধরে টেবিলে ঝুঁকে বসে থাকতেন। রাতের খাবারে সবজি কিংবা মুরগির মাংস ছুঁতেন না, কোনও প্রশ্নের উত্তরও দিতেন না। ১০২ বছরের মানুষকে কেন এত কষ্ট পেতে হল?

ফুমিয়োর সারাজীবন কেটেছে লাইতেত গ্রামে। পাঁচ বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। বয়স্কদের সঙ্গে দল বেঁধে একবার শুধু ২৫০ কিলোমিটার দূরে টোকিও শহরে গিয়েছিলেন। এইরকম বৃদ্ধ মানুষকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলার মানে কী?

মিয়াকোর রাগ টেপকোর ওপর। এই কোম্পানি তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর জন্য দায়ী। নীরবে কাঁদেন আর ভাবেন, ১০২ বছরের বৃদ্ধকেও কেন এত কষ্ট পেতে হবে। দরজা ঠেলে ঢুকে দেখেছিলেন, পরিপাটি করে মেঝেতে পাতা রয়েছে তাতামি মাদুর। ওপরে ১০২ বছরের ফুমিয়ো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন।

লেখক পরিচিতিঃ প্রদীপ দত্ত বিজ্ঞানকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এক অগ্রণী সংগঠক। সুদীর্ঘ তিন দশক ধরে তিনি পরমাণু শক্তির ভালো মন্দ নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন, লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ। বর্তমান নিবন্ধটি 'চর্যাপদ' প্রকাশিত তাঁর বই **মৃত্যুভূমি ফুকুশিমা** থেকে গৃহীত।

কুইজ

১। কবে কোথায় সেন্ট্রাল ম্যালেরিয়া ব্যুরো স্থাপিত হয়েছিল?

২। রক্তের কোন্ শ্বেতকণিকা অ্যালার্জিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়?

৩। কোন্ জায়গায় বসবাসকারী মানুষের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকে?

৪। মানব শরীরের কোন্ গ্রন্থির আর এক নাম তৃতীয় নয়ন?

৫। কোন বিশেষ অস্থিভঙ্গকে 'মোটরসাইকেল-আরোহীর ফ্র্যাকচার' বলে?

৬। মাম্পস একটি ভাইরাসজনিত রোগ- এই রোগে প্রাথমিক ভাবে কোন গ্রন্থি আক্রান্ত হয়?

৭। মাসরুম বা ব্যাঙের ছাতা আজকাল বাঙালীদেরও উপাদেয় খাদ্যতালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। কোন মাসরুম খেলে বিষক্রিয়া হয়?

৮। চোখের গ্লকোমা অসুখটিতে কি হয়?

৯। অরগানোফসফরাস যৌগযুক্ত কীট-নাশকের (যা কৃষি কাজে খুব ব্যবহৃত হয়) বিষক্রিয়া প্রশমিত করার জন্য প্রধানত কোন্ ওষুধ ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়?

এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস।**
বর্তমানে পুনেতে এম.বি.বি.এস. পাঠরত

১০। কোন ভাইরাস জনিত রোগে মৃত্যু শতকরা একশোভাগ নিশ্চিত?

১১। সুপারি, গুটকা জাতীয় জিনিস মুখে রাখার অভ্যাস থাকলে 'সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস' বলে যে রোগ হয় তার বিপদ কি?

১২। বৃক্ক বা কিডনির কার্যকরী একক কি?

১৩। খনিজ ধূলিকণা দ্বারা খনি কর্মিদের যে রোগ হয় তার নাম কি?

১৪। গর্ভাবস্থায় উচ্চরক্তচাপ, পা ফুলে যাওয়া, খিঁচুনি ইত্যাদি লক্ষণ এক অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, সত্ত্বর যার চিকিৎসা প্রয়োজন— এই পরিস্থিতিকে ডাক্তারি পরিভাষায় কি বলে?

১৫। মধ্যকর্ণ ও গলার মধ্যে একটি সংযোগকারী নালী আছে। গলায় সংক্রমণ হলে (বিশেষ করে শিশুদের) এই নালী দিয়ে মধ্যকর্ণে সংক্রমণ পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকে। এই নালীর নাম কি?

উত্তর ৩২ পাতায়

বিষের কৃষি : নেপথ্যের অন্যকথা

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন, খাদ্যাভাস, কৃষি-শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আঙিনা সবই ভুবনায়নের জ্বরে জর্জরিত। বৃহদাকার বীজ-সার-জৈব প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত ধরণের ফসলের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে চাইছে। ভারতের প্রথম সবুজ বিপ্লবে সে-কাজ আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার অমাদের কৃষির অবশিষ্ট নিজস্বতাকে গ্রাস করতে আসছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব লিখছেন— **ড. কল্যাণ রুদ্র**।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল কিন্তু দ্বিখন্ডিত হল আমাদের মাতৃভূমি। ১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে আবার লড়াই— জাতীয় অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। দেশজোড়া খাদ্যসংকট, ওপার থেকে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য খাদ্য, পুনর্বাসন ইত্যাদি নানা সমস্যায় সরকার তখন দিশেহারা। সেই ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এল যে দেশ তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুসারে তখন আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই গম এল। তারাই প্রস্তাব দিল কৃষিক্ষেত্রে প্রকৌশলগত পরিবর্তনের যার পোশাকি নাম প্রথম সবুজ বিপ্লব। প্রথম সবুজ বিপ্লব ছিল উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বড় আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে খনিজতেল নির্ভর করে তোলাই ছিল ওই কোম্পানিগুলির বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সালের মধ্যে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধীরে ধীরে ৮ কোটি টন থেকে ২৩ কোটি টন অতিক্রম করেছে। ঐ সময় ভারতে সেচ সেবিত এলাকার ব্যাপ্তি ২.২ কোটি হেক্টর থেকে বেড়ে ১০ কোটি হেক্টর অতিক্রম করেছে। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৃতিত্ব কতটা সেচ ব্যবস্থার আর কতটা উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। জানা যায়নি ভূ-জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিমাণ। উল্লেখ্য ঐ বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৭ ও ৪ গুণ। এতকিছুর পরেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক এলাকাতেই নিম্নমুখী। অন্যদিকে ক্রমশ বেড়ে চলেছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দাম। চাষ করলে শুধু খরচটুকুই লাভ— বলছেন কৃষকরা।

এমন অবস্থায় ভারত সরকারের ২০১০-১১ সালের বাজেটে পূর্বভারতের ৬টি রাজ্যে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব বা চির সবুজ বিপ্লবের প্রস্তাব করা হয়েছে— প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। সরকার বলছে— পৃথিবীর মাত্র ৩ শতাংশ কৃষি জমি ভারতের অথচ এদেশে বাস করেন ১৭ শতাংশ মানুষ। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে এবং বিদেশের বাজারে খাদ্য রপ্তানি করতে আমাদের চাই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব।

	প্রথম সবুজ বিপ্লব	দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব
স্থান	উচ্চ গঙ্গা সমভূমি (হরিয়ানা, পাঞ্জাব উত্তর প্রদেশ)	নিম্ন গঙ্গা সমভূমি (বিহার, পঃ বঙ্গ, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা)
প্রযুক্তি	উচ্চ-ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, বড় বাঁধ ও ভূ-গর্ভস্থ জল	বংশাণু বা জিন পরিবর্তিত বীজ
নেপথ্যের বহুজাতিক	রক ফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন	মনসান্তো, আর্চার দানিয়েল মিডল্যান্ড, ওয়ালমার্ট
বৈশিষ্ট্য	দেশজ বীজের বদলে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার	জিন পরিবর্তিত বীজ ব্যবহার
কেন পূর্ব ভারতে	হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশে এখন মাটি বন্ধ্যা, ভূ-গর্ভস্থ জল প্রায় নিঃশেষিত	নিম্ন গঙ্গা সমভূমি উর্বর ও জলসম্পদে সমৃদ্ধ
উদ্বেগের কারণ	ভূজীববৈচিত্র্যের অপূরনীয় ক্ষতি	জিন পরিবর্তিত ফসলের সাথে পরাগ মিলনের ফলে দেশজ ফসল ধ্বংস হবে, কৃষক বীজের অধিকার হারাবে, হারিয়ে যাবে জীববৈচিত্র্য, লুণ্ঠিত হবে জলসম্পদ, প্রতিষ্ঠিত হবে বহুজাতিক কোম্পানির একাধিপত্য

জলাধার-খালের নেটওয়ার্ক, মাটির নীচ থেকে জল তোলার প্রকৌশল ইত্যাদি মিলে একটি প্যাকেজ যার নেপথ্যে ছিল রক ফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মতো বহুজাতিক কোম্পানি। সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫২২ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১৮৬০ কিলোগ্রাম হয়েছে, কিন্তু উৎপাদন ৩.৬৫ গুণ বাড়াতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ

প্রথমেই প্রথম ও দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে নেওয়া যাক।

শেষ হয়ে যাচ্ছে মাটির নীচের জল :

মাটির নীচের জল আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ

উত্তরাধিকার। বিনা আয়াসে পাওয়া সম্পদ আমরা হেলায় হারাতে বসেছি। হাজার বছর ধরে মাটির নীচে সঞ্চিত সেই জল ভান্ডার আজ একাধারে রিক্ত ও বিষাক্ত। বিপন্ন আমরা ও আগামী প্রজন্ম। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অর্জুন মেদিনী বিদীর্ণ করে জল তুলে এনেছিলেন। মহাভারতের এই কাহিনী মাটির নীচ থেকে জল তোলার প্রথম লিখিত বর্ণনা। লুকিয়ে থাকা বিপুল জলসম্পদের সন্ধান পেয়েও আমাদের পূর্বজরা সেই জল ব্যবহার করতেন সংযত ভাবে। কারণ তাঁরা জানতেন মাটির নীচের জলসম্পদের যথেচ্ছ উত্তোলনের প্রক্রিয়ার সুদুরপ্রসারী আঘাত লাগবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের নানা স্তরে। সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা বেড়েছে অপ্রতিহত গতিতে, একই সাথে বেড়েছে জলের চাহিদা। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভেঙে যায় সব সামাজিক বিধি নিষেধ। নলকূপের পাইপ পৌঁছে যায় মাটির গভীরতর স্তরে। বর্ষায় যতটা জল মাটির নীচে প্রবেশ করে তার তুলনায় অনেক বেশি জল তোলার ফলে ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে হাজার বছর ধরে জমা জলভান্ডার। এই ঘটনা ঘটছে ভারতের প্রায় সর্বত্র, ব্যতিক্রম নয় একদা সুজলা সুফলা বাংলাও। সম্প্রতি কেন্দ্রিয় ভূ-জল পর্ষদ জানিয়েছে, রাজ্যের ১৩টি জেলায় মাটির নীচের জলস্তর যে হারে নামছে তা গভীর উদ্বেগের কারণ। কালো তালিকায় নাম উঠেছে ৬৮ টি ব্লকের। অনেক সহ্য করে প্রকৃতি এখন জানান দিচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, পলিস্তরে সঞ্চিত থাকা ফ্লুরাইড ও আর্সেনিক সক্রিয় হয়ে বিষাক্ত করে দিচ্ছে মাটির নীচের জল আর সেই জল পান করছে প্রায় দু'কোটি মানুষ। ২০১০-এর বর্ষাকালে দক্ষিণবঙ্গে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি হয়েছে, সেই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাটির নীচ থেকে জল তুলে, ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

কিন্তু কেন এমন হল? এই আলোচনার শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের জলচক্রের ছবিটা জেনে নেওয়া দরকার। এই রাজ্যের বৃষ্টিপাতের সময় ও স্থানগত বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। কোচবিহার জেলায় বছরে প্রায় ৩২৭২ মিমি বৃষ্টি হয় আর পুরুলিয়াতে হয় ১৫০৭ মিমি। রাজ্যের ১৯টি জেলার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭৬২ মিমি- এর প্রায় ৭৫ শতাংশ ঝরে পড়ে বর্ষার চার মাসে। সেই সময় উদ্বৃত্ত জল ও তারপর দীর্ঘ আট মাসের অনাবৃষ্টি বাংলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য। গত দুই দশকের গড় করলে দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে বছরে বৃষ্টি হয় যথাক্রমে ৮৮ ও ৭৯ দিন। প্রকৃতির বদান্যতায় আমরা প্রতিবছর যে জল পাই তার পরিমাণ হল ১২.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার; এর থেকেই ৩.৪২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার মাটির নীচে প্রবেশ করে আর ৮.০৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার বাষ্পীভবন ও বাষ্পীমোচনের মাধ্যমে বাতাসে ফিরে যায়। বলা প্রয়োজন, এ রাজ্যের মাত্র ১৩ শতাংশ এলাকা বনাঞ্চল আর প্রায় ৬২ শতাংশ

এলাকা কৃষি জমি। ফলে বাষ্পীমোচনের মূল অংশ হল সেচের জল। আরও একটি বিষয় হল গঙ্গা, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ইত্যাদি নদী প্রায় ৬০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার জল এই রাজ্যের বাইরে থেকে বয়ে আনে। এই জলস্রোতের প্রায় ৮০ শতাংশ চলে যায় বর্ষার চার মাসে, অন্য সময় অনেক নদীই শুকিয়ে যায়। নদীর জল পানীয় হিসেবে শুধু শহরাঞ্চালের কিছু ভাগ্যবান মানুষ ব্যবহার করেন, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ গ্রামে থাকেন; তাদের পানীয় জল আসে মাটির নীচ থেকে।

আমাদের জলের চাহিদা নানা ধরনের। ২০০১ সালে আমরা সারা বছরে যত জল ব্যবহার করেছিলাম তার ৭২ শতাংশ হল সেচের জল। পানীয় জল ও গৃহস্থলির চাহিদা ছিল কৃষির তুলনায় অনেক কম- মাত্র দুই শতাংশ। শিল্পের চাহিদাও মাত্র ২.৪৯ শতাংশ। সবক্ষেত্র মিলিয়ে ঐ বছর মোট জলের চাহিদা ছিল ১০.৬১ মিলিয়ন হেক্টর মিটার, ২০১১ ও ২০২১ সালে তা বেড়ে হবে যথাক্রমে ১২.০৫ ও ১৪.৩২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। অর্থাৎ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের জলের চাহিদা যোগানকে অতিক্রম করবে।

জলের এই সংকটের সূচনা হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় যখন সবুজ বিপ্লবের ছোঁয়ায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে এ রাজ্যের কৃষির প্রকৌশলও আমূল বদলে গেল। আগে কৃষকরা ফসল নির্বাচন করতেন জলের প্রাপ্যতা অনুসারে, শুখা মরশুমে এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টির এলাকায় এমন ফসলের চাষ হত যাতে জল কম লাগে। সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে খাদ্য সুরক্ষার অজুহাতে শুরু হল অন্য ধরনের চাষ; দেশজ বীজের বদলে এল নতুন বীজ যার জলের চাহিদা অনেক বেশি। শুরু হল শুখা মরশুমে বোরো ধানের চাষ। যে সময় বোরো চাষ হয় (জানুয়ারি-এপ্রিল) সেই সময় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয় মাত্র ১২৫ মিমি অথচ ঐ চাষের জন্য প্রয়োজন ১৫০০ মিমি জল। অন্যভাবে বলা যায় এক কিলোগ্রাম বোরো ধান উৎপাদনে ৪৮০০ লিটার জল লাগে, যার প্রায় সবটাই টেনে তোলা হয় মাটির নীচ থেকে। অনেকেই জানেন না বোরো ধান উৎপাদনের জন্য যে মোট পরিমাণ জল খরচ হয় তা দিয়েই দ্বিগুণের বেশি গম উৎপাদন করা যায়। এখন দক্ষিমবঙ্গের অনেক এলাকাতেই শুখার সময় অগভীর নলকূপ কাজ করে না। প্রকৃতি এখন দেউলিয়া, ফলে গভীর সংকটের মুখে রাজ্যের কৃষি অর্থনীতি।

নদীর পলি ও জল এদেশের কৃষির মূল উপাদান। আপাত বিধ্বংসী বন্যাও এখানে বয়ে আনে সৃষ্টির বার্তা। কৃষি জমিতে নতুন পলি ফেলে বন্যার জল নেমে গেলে কৃষকরা চাষ শুরু করতেন, কোনও রাসায়নিক সার ছাড়াই প্রচুর ফলন হত। ব্রিটিশরা আসার পর এদেশে নদী-জল-পলির এই আন্তঃসম্পর্কটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হল নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পর শুরু হল বড় বাঁধ নির্মাণের নতুন যুগ। বড় বাঁধের লাভ-ক্ষতি নিয়ে পৃথিবীজোড়া বিতর্কের অন্ত নেই। বহুদিন ধরেই মানুষ চেষ্টা করেছে বর্ষার জল সংরক্ষণ করে শুখা

মরশুমে সেচের জন্য ব্যবহার করতে। পরে সংরক্ষিত জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো, মৎস চাষ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে বাঁধগুলি ছিল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ছোট, পরে বাঁধের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার হুভার বাঁধ আজও নির্মাণ প্রকৌশলের বিস্ময়, বলা হয় ঐ বিশাল বাঁধটি চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু বাঁধ নির্মিত হয়। ২০০৯ সালে নির্মিত চিনের থ্রি গর্জেস ড্যাম বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার যা ৪০০০ কোটি ঘনমিটার জল ধারণ করতে পারে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর চোখে বড় বাঁধ ছিল উন্নয়নের প্রতীক। তিনি ভেবেছিলেন, 'বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়।' জীবনের শেষপর্বে বড় বাঁধ নিয়ে নেহেরুর মোহভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রিয় সেচ ও শক্তি দপ্তরের বার্ষিক সভায় তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এক লোক দেখানো বৃহদায়তন প্রকল্প নির্মাণের বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত, আমাদের ফিরতে হবে ছোট ছোট প্রকল্পে আর সেই পথেই দেশের বৃহত্তম মঙ্গল।' তাঁর সেই অনুধাবন উত্তরসূরীদের প্রভাবিত করে নি; তারপরেও তৈরি হয়েছে অনেক বাঁধ। নানা প্রকল্পে টাকা যোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। আর এই বিপুল পরিমাণ ঋণ সুদসহ শোধ করছে দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই। একথা আজ সরকারি প্রতিবেদনেও স্বীকার করা হয়েছে যে বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি আর এত মানুষের চোখের জলে নির্মিত বড় বাঁধগুলি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জলাধারে সংরক্ষিত জলের বেশিরভাগই বাষ্পীভূত হচ্ছে বা খালের নীচের মাটি টেনে নিয়েছে; মাত্র ৩৮-৪০ শতাংশ জল সেচের কাজে লেগেছে। এই ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে মাটির নীচের জলভান্ডার থেকে। আর সেচের জলের যোগান দিতে গিয়ে ভূ-গর্ভ জলের ভান্ডার আজ অনেক স্থানেই রিক্ত। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা গেছে যে ২০০২-২০০৮ সালের মধ্যে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ১০৯ ঘন কিমি জল মাটির নীচ থেকে তোলা হয়েছে। নিবন্ধটির লেখকরা বলেছেন, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে ঐ এলাকার প্রায় ১১.৪০ কোটি মানুষ জলাভাবে বিপন্ন হবেন।

জিনের বিষ ও বিপন্ন বাস্তুতন্ত্রঃ

প্রথম সবুজ বিপ্লব ছিল রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল বীজ নিয়ে এক প্যাকেজ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দেহে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের প্রভাব নিয়ে এখনও তেমন গবেষণা হয় নি। তবে একথা অজানা নয় যে যথেচ্ছ কীটনাশকের প্রভাবে চাষের জমিতে এখন আর কেঁচো বা মৌমাছি দেখা যায় না। রাজ্যজুড়ে ভূ-গর্ভ জলস্তর নিম্নগামী, ১৩০টি ব্লকের জল আর্সেনিক বা ফ্লুরাইড বিষাক্ত। কলকাতা শহরের নলকূপের জলেও পাওয়া গেছে আর্সেনিকের বিষ। প্রতিদিন খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকছে সেই বিষ। রাজ্যজুড়ে অন্তত দু'কোটি মানুষ পান করছেন

আর্সেনিক বা ফ্লুরাইড বিষাক্ত জল। বহু মানুষ চর্মরোগ বা ক্যান্সারে আক্রান্ত। এখানেই শেষ নয়, বামফ্রন্ট সরকার চেয়েছিল এই রাজ্যে বংশাণু বা জিন পরিবর্তিত ধানের চাষ শুরু করতে। এই উদ্যোগের দোসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের এক অধ্যাপিকা। চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রে প্রথমে ওই ধানের গবেষণা চলছিল জালের ঘরে। জেনেটিক এপ্রুভাল কমিটি শর্ত দিয়েছিল খোলা মাঠে জিন পরিবর্তিত ধানের চাষ শুরু করতে হলে চারপাশে অন্তত ২০০ মিটার এলাকা ছেড়ে রাখতে হবে যাতে বংশাণু বা জিন পরিবর্তিত ধানের পরাগরেণু দেশজ ধানের ক্ষেতে উড়ে না যেতে পারে। তেমন হলে জন্ম নেবে দ্বিতীয় প্রজন্মের ফসল, দেশজ ধানের চাষ নষ্ট হয়ে যাবে; এই ভাবেই দূষিত হয়েছিল মেক্সিকোর দেশজ ভুট্টার ক্ষেত। গত নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্য কৃষি দপ্তর পাশের জমির সাথে মাত্র ১০ মিটার দূরত্ব রেখে জিন পরিবর্তিত ধানের চাষের অনুমোদন দিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা জিন পরিবর্তিত ধানের চাষ শুরু হলে ওই গবেষণা কেন্দ্রে রাখা প্রায় ৯০টি প্রজাতির প্রজনক বীজ সহ ১২০০ প্রজাতি ধানের বীজ ধ্বংস হয়ে যাবে; আমাদের কৃষি ব্যবস্থা চিরকালের জন্য কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এই ভয়াবহ চক্রান্ত এখনই বন্ধ না হলে রাজ্যের ভূজীববৈচিত্র্যের সর্বনাশ আসন্ন। কেরল, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার ইতিমধ্যেই জিন পরিবর্তিত ধানের চাষ নিষিদ্ধ করেছে। উল্লেখ্য রাজ্যের নবনির্বাচিত সরকার আপাতত ওই গবেষণা বন্ধ রেখেছে, পরামর্শ নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটির, তবে ওই রিপোর্ট এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় নি। জিন পরিবর্তিত ধানের প্রবক্তারা বলছেন এই চাষে কীট ও আগাছানাশকের ব্যবহার কমবে। কিন্তু বিটি তুলোর ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের কৃষকদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ওই তুলোর চাষ শুরু হওয়ার পর কীটনাশকের প্রয়োগ কমে নি বরং বেড়েছে। কিন্তু কৃষকের পক্ষে এখন আর দেশজ বীজে ফেরা সম্ভব নয়; তাঁরা চিরকালের জন্য বাঁধা পড়েছেন বহুজাতিক বীজকোম্পানির ফাঁদে।

কেন নিম্ন গঙ্গা সমভূমিঃ

প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে দেশের চিরায়ত কৃষি বদলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তর প্রদেশের মতো কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় শুরু হয়েছিল ধান, আখ ইত্যাদি এমন ফসলের চাষ যাতে অনেক বেশি জল লাগে। এছাড়া ছিল গমের চাষ। সেই সময় থেকে উচ্চগঙ্গা খাল, ভাকরা-নাঙ্গাল খাল সেচের জলের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হল মাটির নীচ থেকে জল তোলা। বর্ষায় যতটা জল মাটির নীচে ঢোকে তার থেকে বেশি জল টেনে তোলার ফলে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ভূগর্ভ জলভান্ডার। যে এলাকাকে বলা হত ভারতের খাদ্যভান্ডার এখন সেই এলাকাই বিপন্ন, রিক্ত। ক্যান্সারে আক্রান্ত বহু মানুষ, ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে আত্মহত্যার মিছিল।

নিম্নগঙ্গা সমভূমি তুলনাহীন উর্বর এবং প্রকৃতির নিয়মেই জলসিক্ত। এমন সমৃদ্ধ এলাকা ভুবনীকরণের কারবারিদের নজর এড়িয়ে যাবে না এটাই স্বাভাবিক। এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের টানে বেনিয়ারা বারেবারে হানা দিয়েছে, সেই অতীত থেকে। এখন সময় বদলেছে, বাজার অর্থনীতি পরিবেশের ভারসাম্য বা আগামী প্রজন্মের স্বার্থ ইত্যাদি বিষয় গ্রাহ্য করে না, মুনাফাই এখন শেষ কথা। ২০০৩ সালে ভারত সরকার চেয়েছিল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মহানদী

অববাহিকা থেকে ১৭৩০০ কোটি ঘনমিটার জল দক্ষিণ ভারতের খরাপ্রবণ এলাকায় নিয়ে যেতে, প্রবল জনমতের চাপে বেশ কিছুটা পিছু হটে সরকার এখন কৌশল বদলেছে। এবার পূর্ব ভারতের জল দেশান্তরে যাবে ফসলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে। বহু ব্যবহারে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার মাটি এখন অনুর্বর ও লবণাক্ত। মাটির নীচের জলসম্পদ নিঃশেষ হওযার মুখে, এখন চাই নতুন কৃষি এলাকা। তাই এবার লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারত। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিবছর খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের সাথে প্রায় ১০৬ ঘনকিমি জলও চলাচল করে। এই জল ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত মোট জলের ১৫ শতাংশ। সব থেকে বেশি জল অন্যত্র চলে যায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশে মোট উৎপাদিত গম ও ধানের যথাক্রমে ৫২ ও ৪৮ শতাংশ উৎপাদন হয় পাঞ্জাবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বংশাণু বা জিন পরিবর্তিত শস্য মানুষের খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ। কঠোর বিধিনিষেধের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলি ও আমেরিকা তাদের ভূজীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করে। তবু দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা হয়েছে ভারত-মার্কিন জ্ঞান চুক্তি (২০০৫) তে। জিন প্রযুক্তি নির্ভর এই পরিকল্পনা দেশের ভূ-বৈচিত্র্য ও মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক তা অনেকটাই অন্ধকারে। তবু সংসদে এমন বিল আনা হচ্ছে যা লাগু হলে বংশাণু বা জিন পরিবর্তিত শস্য চাষ বা গবেষণার বিরোধিতা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এমনকি কৃষকের ঘরে বীজ জমিয়ে রাখার অধিকারও থাকবে না। মনে পড়ছে মার্কিন কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জারের সেই বিখ্যাত উক্তি: ''তুমি যদি খনিজ তেলের উপর দখলদারি কায়েম কর তবে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আর যদি খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পার তবে মানুষ তোমার অধীনে থাকবে।" দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব আমাদের কৃষির উপর সর্বাত্মক দখলদারির নীল নকশা।

লেখক পরিচিতি : ড. কল্যাণ রুদ্র ভূগোলে পি. এইচ.ডি., বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদ। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান ও অন্যান্য পরিবেশ বিষয়ক সরকারি কমিটির সদস্য।

advt.

With Best Compliments from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, Kalindi Housing Estate
Kolkata- 700089

জিন-বলে রোগ-আরোগ্য ও ছলে-বলে প্রজনন ব্যবসা

হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট। টেস্ট টিউব বেবি। জিন নিয়ে কারিকুরি। ডিজাইনার বেবি। জিন থেরাপি। শব্দগুলো আমরা শুনি। কিছু বুঝি আর কিছু বুঝি না। বোঝা না বোঝার ধোঁয়ার মধ্যে মনে হয় এই বুঝি এসে গেল মানব প্রজাতির সকল দুঃখের মূল উৎপাটন করার মতো এক প্রযুক্তি। আলাদীনের জিন আর জিন প্রযুক্তির জিন আমাদের স্বপ্নে-কল্পনায় একাকার হয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় কঠিন বাস্তবটি যে কি, সেটা জানাচ্ছেন **ড. তুষার চক্রবর্তী**।

বাহুবল আর বাক্যবলের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। একুশ শতকের বিজ্ঞান ও জিন প্রযুক্তি বাহুবল আর বাক্যবলের সঙ্গে যেন জিনবল ব'লে আর একটি বল, জীবনে সাফল্যলাভের আর একটি বাড়তি শর্ত হিসাবে যোগ করেছে। বংশগতির সুযোগ ও সুফল এখন প্রযুক্তি দিয়ে যেন বাছাই করে কেনা যায়। সারানো যায় সব রকমের রোগ। এটাই জিন চিকিৎসার দাবী। আর এই নিয়েই দুনিয়া জুড়ে চলছে বিতর্ক। জীবন প্রক্রিয়াটাকে একেবারে শুরু থেকে ছকে ফেলার, নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস তবু থেমে নেই। তা প্রত্যহ একটু একটু করে এগোচ্ছে আর তার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাঘর হয়ে উঠছে মানুষের দেহ— বিশেষতঃ সন্তান, গর্ভ, বীর্য, ডিম্বাণু। রাম জন্মাবার আগে রামায়ণ রচনার মতো সন্তান জন্মাবার আগেই তার সবকিছু নিজের ইচ্ছেয় রচনা করার অদম্য কারুবাসনার গোড়ায় কি এভাবেই ধূপধুনো দেয়া হচ্ছে? আর এর অমানবিকতাকে চাপবার জন্য উল্টোদিক থেকে রচনা করা হচ্ছে অনেকরকম চিত্রনাট্য। সেখানে রোগারোগ্যকে রাখা হচ্ছে সামনে। জনসংকোচনের সামাজিক কারণের দিকে না তাকিয়ে প্রজনন সহায়ক প্রযুক্তি দিয়ে তাকে সামলাবার জোর প্রয়াস চলছে চতুর্দিকে। কৃত্রিম উচ্চমূল্যের প্রজনন প্রকৌশলের হরেকরকম কষ্টকর ঝুঁকি ও ঝক্কি কি এসবের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে? চিকিৎসাবৃত্তে এইসব সুযোগ সন্ধানের টাটকা একটি নিদর্শন নিয়েই আমরা এখানে আলোচনা করব। তবে তার আগে তাকানো যাক প্রজনন বা সন্তান ধারনের ক্রমবর্ধমান আরো নানা সমস্যার দিকে।

পেশা বনাম পরিবার

আজকের দুনিয়ায় একদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি যেমন সমস্যার কারণ অন্যদিকে জনসংখ্যা হ্রাস বহু দেশে সমস্যার আর এক কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। তবে বিশ্ব বা জাতীয় প্রেক্ষিত বাদ দিয়েও সন্তান ধারণের সমস্যা বিবাহিত জীবনের একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই আলোচনার সেটাই বৃহত্তর প্রেক্ষিত। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে - অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে প্রজনন সমস্যা মোকাবিলা করার যে পথ এখন চিকিৎসাক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসেছে, এ আলোচনা তাই নিয়ে। যেসব দেশে জনসংখ্যা হ্রাস যত বেশি ঘটছে সেখানে তত এটি একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে মাথাচাড়া দিচ্ছে। অন্যদিকে আর্থিক উন্নতি এবং নারী স্বাধীনতা, বিশেষতঃ মেয়েদের পেশা ও পরিবারের বাইরের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগ্রহ এবং তা গ্রহণ করার সঙ্গেও প্রজননগত সমস্যার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেটা স্বীকার করা মানে যে প্রগতির শত্রু হয়ে ওঠা, এটা মনে করবার কোনো কারণ নেই। করলে তা হবে প্রকৃত বাস্তবতাকে আবেগের বশে অস্বীকার করা।

পশ্চিমের উন্নয়ন-নির্ভর সমাজ এই সংঘাত এড়াতে নানা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। মেয়েদের জীবনের যে সময়টা গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের পক্ষে উপযুক্ত সেটাই আবার পেশাগত জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুসময়। তাই দুটোকে একত্রে মেলানো কঠিন কাজ। প্রায় যায় না বললেই চলে। বিবাহ, পেশা ও সন্তানধারণ এই তিনটিকে রক্ষা করা পশ্চিমজগতের মেয়েদের কাছে তাই আজ প্রায় অসম্ভব। যাঁরা অত্যন্ত কৃতী ও প্রতিভাবান— তাঁরা এর মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে দুটিকে কোনোমতে সামলান। এই কারণেই সিঙ্গল পেরেন্ট ফ্যামেলির সংখ্যার বিপুল প্রসার ঘটছে; যেখানে শিশুর বাবা অথবা মা (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মা) কোনো একজন থাকেন— অন্যজন অনুপস্থিত। তবে তাতেও সমস্যা সামলানো যাচ্ছে না। আর এই সুযোগে উচ্চ প্রযুক্তির উচ্চমূল্যের জীববিজ্ঞান চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে।

এইসব প্রজনন প্রসার ঘটবার পিছনে আর একটি প্রনোদনা হল— জিন দিয়ে মানুষের শরীর ও আচরণের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়-এমন ধারণা, এই জাতীয় দাবীর লাগামহীন লাগাতার প্রচার। এজাতীয় প্রচার চিকিৎসায় উচ্চমূল্যের উচ্চপ্রযুক্তির কর্মকান্ডের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাড়াবাড়ি এতটাই ঘটেছে-তাকে প্রতারণা বললে ভুল হয় না। যেখানে আশার বাজনা নানা সুরে বাজিয়ে বাজিয়ে বাস্তবতার কঠোর সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়।

প্রযুক্তি নির্ভর প্রজনন

বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য বা প্রজননের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য বেশ কিছু প্রযুক্তি কয়েক দশক হ'ল চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। ইন-ভিট্রো বা গর্ভের বাইরে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার পদ্ধতি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। এইভাবে প্রজাত শিশুদের বাংলায় অনেকে বলেন নলজাতক বা টেস্টটিউব বেবি। যদিও নলজাতক কথাটি অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও কুরুচিপূর্ণ। নিষিক্ত ডিম্ব থেকে দেহের বাইরে মানব শিশু বা পরিণত ভ্রূণ তৈরি যদিও আজ সম্ভব হয় নি। তাই নলজাতক কথাটি স্থূল অর্থে ধরে নিলে ভুল করব। যে গর্ভে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে স্থাপন করে পালন বর্ধন করা হয় তা ডিম্বাণুর জন্মদাতা মায়ের হতে পারে, বা অন্য কোনো উপযুক্ত মহিলার গর্ভও হতে পারে। অন্য মহিলার গর্ভ ব্যবহার করা হলে সেই পালক মহিলাকে বলা হবে ধাত্রীমাতা বা সারোগেট মাদার। আবার কোনো মা নিজের ডিম্বাণুর বদলে অন্যের ডিম্বাণু স্বামী বা বাছাই করা অন্য কারো দ্বারা নিষিক্ত করে গর্ভধারণ করেও নিজেকে মা বলে দাবী করতে পারেন। এই ধরণের প্রযুক্তিতে তাই পণ্যের মতো যিনি প্রকৌশল ক্রয় করছেন সেই ক্রেতা দিয়েই পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ধারিত হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রাথমিক বলে সমাজে স্বীকৃত হচ্ছে না। বাবা বা মার ধারণা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে— যাকে আজকের যুবসমাজ বলেন 'ঘেঁটে যাওয়া'।

প্রকৌশলের দিক থেকে নানা পদ্ধতি ও উদ্ভাবনা এই ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করেছে। কোথাও বাছাই করা স্পার্ম বা শুক্রাণুকে অতিসূক্ষ্ম মাইক্রো ইঞ্জেকশান দিয়ে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করানো হয় (ICSI)। কোথাও জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্বাণুকে মেয়েদের ফ্যালাপিয়ান টিউবে স্থাপন করা হয় (ZIFT) তো কোথাও গ্যামেট অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে মিশিয়ে ল্যাপেরোস্কোপিক পদ্ধতিতে তা মেয়েদের ফ্যালাপিয়ান টিউবে স্থাপন করা হয় (GIFT)।

এইসব পদ্ধতি কতটা নিরাপদ সে নিয়ে বিতর্ক শেষ হয় নি। মজার ব্যাপার হল, এইসব পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের নির্ধারিত সময়ের আগেই জন্মানো ও তার ফলস্বরূপ এই বাচ্চাদের ওজন অন্যান্যদের তুলনায় কম হওয়া, আর যমজ (২ থেকে ৬ টি একবারে জন্মাতে পারে) হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাওয়া-এই তিনটি ঘটনা যদিও সর্বজনস্বীকৃত, তবুও কায়দা করে এক্ষেত্রে এদের স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলে ধরে নেওয়া হয়! এইসব গণনায় আনলে এইসব প্রকৌশল প্রথমেই বাতিল করে দিতে হত। তবে পূর্বোক্ত তিনটি সাধারণ তথ্য মেনে নিয়েও এই শতকে ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনিয়ে যে কটি বড় মাপের তথ্যানুসন্ধান হয়েছে তাতে অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি এসব ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বাড়তে দেখা গেছে। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত ২০০৭ সালের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে ঃ স্বাভাবিক প্রজননে এই ধরনের ত্রুটি ৪.৪ শতাংশ চোখে পড়ে, এবং প্রযুক্তি নির্ভর প্রজননে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.২ শতাংশে। আর এর খরচ? এই প্রশ্ন যাঁরা করবেন তাঁদের এই পরিষেবার চৌহদ্দিতে পা না বাড়ানোই শ্রেয়। মোটা টাকার ইন্সিওরেন্স বা চিকিৎসা বীমা এবং ধনকুবেরদের মর্জির ছত্রছায়ায় এই প্রকৌশল লালিত পালিত হচ্ছে।

তৃতীয় যে ঝুঁকিটির কথা কদাচ এইসব বিশ্লেষণে আনা হয় না, তা হল মা বা সারোগেট মার উপর যেসব হরমোন,ওষুধ ও অপারেশান সহ অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়— তাদের প্রভাব। এঁদের স্তনের ক্যান্সারসহ অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি বেড়ে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি এবং এক দশকের ভেতরে তা বড় আকারে ধরা পড়বে এমনটা মনে হওয়াই যুক্তিগ্রাহ্য। শুধু শিশুদের জন্মগত ত্রুটির হিসেব ছাড়াও এইসব হিসেবকে অবিলম্বে গণনায় আনা দরকার। অথচ সেইসব বিচার বিবেচনা পাশ কাটিয়ে সন্তান সহায়ক প্রকৌশল দেশে দেশে জাঁকিয়ে বসছে। আমাদের দেশেও এমনকি এই রাজ্যেও এই ব্যবসা এখন অত্যন্ত লাভজনক ভাবে চলছে।

ইউরোপে জনসংখ্যার সংকোচন একটা বিরাট সমস্যা। বন্ধ্যাত্বের তালিকাতেও ইউরোপের স্থান সবার উপরে। সেখানে ২৫টি দেশ জুড়ে নেওয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ৬৩১টি ক্লিনিকেই ৩২৪২৩৮ সংখ্যক, অর্থাৎ তিন লাখের বেশি মানুষ এই প্রকৌশলের সহায়তা নিয়েছেন। যেসব শিশু IVF/ICSI পদ্ধতিতে জন্মেছে তাদের প্রায় ৭৫ শতাংশ একক, ২৫ শতাংশ যমজ এবং ১ শতাংশের কিছু বেশি ক্ষেত্রে তিন বা তার বেশি সন্তান একবারে জন্মেছে। আর এসব সত্ত্বেও ইউরোপ এখন প্রজনন সহায়ক প্রকৌশলের প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র। আর জিন প্রযুক্তির প্রচারের সঙ্গে

তাল মিলিয়ে এর প্রসার ঘটাবার চেষ্টা তাই অবিরত নানা ভঙ্গিমায় দেখা দিচ্ছে।

প্রচার: অবিরত নানা মুখ

আমরা সবাই জানি যে বংশগতির নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছিল জোহান মেন্ডেল নামে এক খৃষ্টান যাজকের কৌতূহলে, এক চার্চের বাগানে। প্রায় সাড়ে তিন দশক তা অবহেলিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তা পুনরাবিষ্কৃত হবার পর থেকে জীব এবং জীববিজ্ঞান দুই ক্ষেত্রেই এক নবজাগরণ যেন শুরু হল। আর শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে জিনবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুটোতেই থাবা বসিয়ে অধিকার বিস্তার করল হাতেগোনা কিছু কর্পোরেট শিল্পসংগঠন ও তাদের লগ্নীপুঁজি। কেন্দ্রিভূত এই পুঁজির হাত ধরে কৃষি এবং মানব দেহ এই দুটি ক্ষেত্রে এখন জিনপ্রযুক্তির দাপট ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জিনবিজ্ঞান জাতিবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল ইউজেনিকস নামে এক কলঙ্কিত তত্ত্ব। তার পিছনেও দাঁড়িয়েছিল হাতেগোনা কিছু শিল্পসংস্থা। রকফেলার, বায়ার, আই জি ফারবেন যাদের অন্যতম। হিটলারের ইহুদী গণহত্যার পাপে শিহরিত পরবর্তী যুগের জিনতত্ত্ব তা থেকে নিজেদের প্রায় পুরোপুরি বিযুক্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিংশশতাব্দীর শেষ দুটি দশকে জিন প্রযুক্তি এবং মানব প্রজনন প্রযুক্তির বিকাশের মধ্যে অনেকেই সেই পুরানো অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা আঁচ করছেন। কৃষি এবং মানবদেহ আবার হয়ে উঠেছে জিনশিল্প ও প্রজনন প্রযুক্তির আঁতুড়ঘর।

তবে অনতি অতীতে এই প্রয়াস দুটি বড় ধাক্কা খেয়েছে। একটি হল বিপুল উৎসাহে শুরু করা জিন চিকিৎসার ব্যর্থতা। ল্যাবরেটরিতে অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখাবার পর মানুষের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে তা বিফল শুধু নয়— বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই চুপিসারে জিনচিকিৎসার ক্ষেত্র থেকে আপাতত হাত গুটিয়ে নিয়েছে উদ্যোক্তারা। বিজ্ঞানের জার্নালে ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে এই জিন চিকিৎসার ব্যর্থতার খতিয়ান ছাপা হলেও জনসমক্ষে তা তেমন ভাবে আনার এবং আলোচনার সৎসাহস দেখানো হয় নি। দ্বিতীয় ধাক্কাটি অবশ্য ঘটেছে প্রকাশ্যে। ক্লোনিং নিয়ে বিজ্ঞানী এবং কর্পোরেট জগতের বিপুল প্রচার সত্ত্বেও বিশ্বের কোথাও তা জনসমাজের অনুমোদন আদায় করতে সক্ষম হয় নি। ক্লোনিং -এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন ধর্মীয় সংগঠন থেকে শুরু করে প্রায় আপামর জনসাধারণ। তাই বাস্তব জগতে ধাক্কা খেয়ে আপাতত পিছু হঠতে বাধ্য হলেও এই প্রয়াস ঘুরপথে ফিরে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার এই ঘুর পথে অনুপ্রবেশের একটি সাম্প্রতিক নিদর্শনের দিকে আমরা তাকাব। যেখানে এমন চোরাগোপ্তা কায়দা প্রযুক্ত হয়েছিল এবং তা সরাসরি চিহ্নিত হয়েছে। ঘটনার স্থান বৃটেন। কাল জানুয়ারি ২০১২। পাত্র ওয়েলকাম ট্রাস্ট নামে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ফামাসিউটিক্যাল কোম্পানির পাবলিক পরিচালিত ট্রাষ্ট। এরা ভারতেও ডিপার্টমেন্ট অব বায়োটেকনলজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতের জিনপ্রযুক্তি গবেষণায় নাক গলাচ্ছে।

বৃটেনের নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির এক গবেষক গোষ্ঠী ওয়েলকাম ট্রাস্টের কাছ থেকে এই

মন্দার বাজারে ৬ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি অনুদান পেয়েছেন। খবরটি ওখানকার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। খবরের চমক লাগানো শিরোনাম: এক পিতা ও দুই মাতার সন্তান। গবেষকরা মায়ের ডিম্বাণুর মাইটোকন্ড্রিয়া নামের কোষাঙ্গটিকে বদলে ফেলে মাইটোকন্ড্রিয়ায় জিনগত ত্রুটির কারণে যেসব জন্মগত রোগ হয় তাদের নিরাময় ঘটাতে এখানে উৎসাহী। আমরা জানি যে কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে প্রায় ৯৯.৮ শতাংশ জিন আর বাকি মাত্র ০.২ শতাংশ জিন থাকে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে। বেশ কিছু রোগের কারণ এই মাইটোকন্ড্রিয়ায় নিহিত থাকে। আর সন্তানের মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রায় পুরোটাই আসে মায়ের তরফ থেকে। বাবা ও মা-এই দুই তরফের জিনোম থেকে সন্তানের জিনগত সংমিশ্রণের চিরাচরিত ছবিটা মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনের ক্ষেত্রে খাটে না। উক্ত গবেষকরা মাইটোকন্ড্রিয়ার এই এততরফা চলনকেই বদলাবার জন্য IVF ও ক্লোনিং-এর একটা মিশ্র প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে উৎসাহী। গবেষকরা মানুষের উপর পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে একেবারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাবার অনুমতি চান। আপাত নিরীহ এই আবেদনে এক ঢিলে তিন পাখি মারবার পরিকল্পনা লুকিয়ে ছিল।

প্রথমত: উদ্দেশ্য ছিল গাড্ডায় মুখ থুবড়ে পড়া জিনচিকিৎসার অচল গাড়িকে মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনচিকিৎসার নামে চালু করবার একটা পথ তৈরি করা।

দ্বিতীয়ত: ক্রমবর্ধমান IVF নিয়ে ওঠা বিতর্ক চাপা দেওয়া। দেখানো যে তা অনন্য প্রযুক্তির সহায়ক হিসেবে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়ত: এই গুহ্য উদ্দেশ্যটি সবচাইতে বিতর্কিত। আসলে ক্লোনিং-এর অত্যাবশ্যক অঙ্গ কোষের কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসকে বদলাবার কাজটি এই প্রকৌশলের অঙ্গ। এখানে সারোগেট বা ধাত্রীমার ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস সরিয়ে সেখানে মায়ের ত্রুটিযুক্ত মাইটোকন্ড্রিয়া বাদ দিয়ে কেবল কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসটিকে নিয়ে তা ধাত্রীমার নিউক্লিয়াস খোয়ানো কোষে বসানো হচ্ছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে মায়ের ডিম্বাণুর মাইটোকন্ড্রিয়া বদলানো হচ্ছে- যা করার কথা তা হল ধাত্রীডিম্বাণুতে মাতৃডিম্বাণুর প্রবেশ। এটা অত্যন্ত জটিল প্রকৌশল। মানুষের উপর প্রযুক্ত হলে তা বকলমে ক্লোনিং-এর পথ সুগম করবে। নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন করা নিরাপদ না অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ তা অংশত দেখিয়ে দেবে। একাজে খানিক সাফল্য পেলেও তাকে তখন ক্লোনিং-এর কার্যকারিতার স্বপক্ষে প্রমাণ বলে দাবী করা হবে।

যাইহোক এই পাকা মাথার পরিকল্পনা কিন্তু শেষপর্যন্ত সফল হয় নি। ব্রিটেনের ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ অকথিত প্যাঁচটা ধরে ফেলেছে। তারা দুটি মা একটি বাবার এই পরীক্ষাকে ছাড়পত্র দেবার আগে এবিষয়ে জনমত নিতে বলেছে। বলেছে এবিষয়ে আগে জনমত সংগ্রহ করা হোক। তারপর বিলেতের পার্লামেন্টে এ নিয়ে বিতর্ক চলবে। তারপর আসবে মানুষের উপর এ জাতীয় পরীক্ষা চালাবার বা হিউম্যান ট্রায়ালের অনুমতি দেবার প্রশ্ন।

মাইটোকন্ড্রিয়া ও মানব ব্যাধি

ব্রিটেনে প্রতি বছর প্রায় ২০০টির মতো শিশু মাইটোকন্ড্রিয়াজনিত রোগ নিয়ে জন্মায়। এদের চালচলনে জড়তা দেখা যায়। মাংসপেশির ক্ষয় এদের একটা প্রধান রোগলক্ষণ। আর মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে ঘটা অ্যাটাক্সিয়া দেখা যায় প্রতি ৬৫০০ জনের মধ্যে একজনে। ওয়েলকাম ট্রাস্ট এই পরীক্ষার পক্ষে জোরদার সাওয়াল করছে। তাদের একজন কর্তার মতে পদ্ধতিটা ক্যামেরার ব্যাটারি বদলের মতো সোজা। একেবারে জলভাত! তা যদি সত্যি সত্যি হোত তাহলে এতদিনে বেশ কিছু ক্লোন করা মানুষ আপনার চারপাশে দেখতে পেতেন। জানা যাচ্ছে যে IVF ক্লিনিকে ফেলে দেওয়া পরিত্যক্ত ভ্রূণ নিয়ে গবেষকরা এই কাজের খানিকটা করে হাত পাকিয়েছেন। এই কাজে বৃটেন বেআইনি নয়— কিন্তু আমেরিকায় ও ইউরোপের জার্মানি সহ অন্য বহু দেশে এই কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই নিয়ে বিশ্বজুড়ে একটা হৈ চৈ যে উঠবে তা অবধারিত।

দুটি সংস্থা, একটি হল SPUC (Society for the Protection of Unborn Child) বা স্পাক (যে শিশুরা জন্মায়নি তাদের রক্ষা সমিতি) এবং অন্যটি প্রজননের নৈতিকতা সমিতি বা CORE(Committee of Reproductive Ethics)-এই নিয়ে সরব হয়েছে। এদের মূল প্রশ্ন যে শিশুরা এভাবে জন্ম নেবে পরে তারা নিজেরা যদি এর প্রতি বিরূপ হয় এবং হীনমন্যতায় বা বিরাগে ভোগে- তাদের দায় কার উপর বর্তাবে? জন্ম পদ্ধতির এই জাতীয় বিভাজন সমাজে মা বাবার সংজ্ঞা, আইনের ক্ষেত্রে যেরকম সমস্যা ডেকে আনবে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে প্রচলিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উপর এই জাতীয় পদ্ধতির বিপুল ব্যয়ভার চাপালে সেটা হবে আরো বড় অন্যায়। চিকিৎসার প্রয়োজন ও ব্যয় কমানো না বাড়ানো কোন্‌টাকে আমরা অগ্রাধিকার দেব- এটাই মনে হয় সবার আগে ভাবতে হবে।

উপসংহার হিসেবে এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট যে জিনচিকিৎসা ও প্রজনন প্রকৌশলের ফেরিওয়ালাদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। আজকের যুগে জনসংখ্যার স্ফীতি ও সংকোচন দুটোই পাশাপাশি ঘটছে- যার পিছনে রয়েছে সমাজে শিক্ষা ও অধিকারের অসম বিকাশ। ভুল ক্ষেত্রে, ভুল প্রযুক্তি দিয়ে সমস্যা বাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই- শিক্ষা এবং সমতার অধিকারের মধ্যে দিয়েই এই জনসংখ্যায় ভারসাম্য আনা যেতে পারে। আর সর্বোপরি এটাও মনে রাখতে হবে যে আজকের বিশ্বায়িত সংকটে চিকিৎসা ক্ষেত্রে টেকসই এবং ট্যাঁকসই হয়ে ওঠা (Sustainable) দুটোই সমান জরুরি। দুটোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, না হলে সেটাই হবে সবচাইতে অনৈতিক কাজ।

সমাজের ৯৯ শতাংশকে বাদ দিয়ে ১ শতাংশ ধনকুবেরদের দখল করা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি অবশ্য জিনবলে রোগারোগ্য ও প্রজননের প্রকৌশল আকর্ষক পসরা হিসেবে সাজিয়ে এর ঠিক উল্টোপথেই হাঁটছে।

লেখক পরিচিতি: তুষার চক্রবর্তী, জন্ম ১৯৫৮, পেশায় অণুজীববিজ্ঞানী। পি এইচ ডি কলকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দিরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম ডি অ্যান্ডারসন ক্যান্সার সেন্টারে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দেশে ফিরে ১৯৯৩-এ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজিতে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন এবং সেখানেই বর্তমানে প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট। মাঝখানে কিছুদিন ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচ্যুসেট এবং লুইসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের নানা দিক নিয়ে কাজ ও লেখালেখি করেন। বাংলায় প্রকাশিত বই **জিন: ভাবনা-দুর্ভাবনা**। e-mail: chakraborty.tushar@gmail.com

সপ্তপদী ঃ ডাক্তার বাবু যখন বাবাসাহেব

অংশুমান ভৌমিক

দুশো। উত্তমকুমার অভিনীত বাংলা ছবির সংখ্যা কমসেকম দুশো। এই দ্বিশতাধিক ছবিতে কতরকম চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার? অগুনতি। যে বাঙালি মধ্যবিত্ত তাঁর সিনেমার সমঝদার ছিলেন, যাঁরা ছবিঘরে তাঁদের স্বপ্নপূরণের চিত্রভাষ দেখতে যেতেন তাঁদের চেনা জানার চৌহদ্দির মধ্যে হেন চরিত্র নেই যা হয়ে ওঠেননি উত্তমকুমার। গায়ক হয়েছেন, নায়ক হয়েছেন। শিল্পী হয়েছেন, লেখক হয়েছেন। চাঁপাডাঙার বৌ-তে খালি পায়ে লাঙল চালিয়েছেন। পৃথিবী আমারে চায় -তে 'নিলামওয়ালা ছ আনা/ এই লে লো বাবু ছ আনা' বলে পাড়ায় পাড়ায় রঙিন ফিতে-খোঁপার কাঁটা-কানের দুল ফিরি করেছেন। সবরমতী-তে তাঁত চালিয়েছেন। কুহক-এ তিনি পকেটমার। সাথী হারা-য় বেদে। প্রিয় বান্ধবী-তে সমাজবিরোধী। শেষদিককার ছবিতে অঢেল মাতলামো করেছেন। অমানুষ-এর মাতলামির সঙ্গে কিঞ্চিৎ লাম্পট্যও ছিল। ওগো বধূ সুন্দরী-তে কলকাতার ক্লাব কালচারের উপচে পড়া বৈভবকে বিদ্রূপ করেছেন উত্তমকুমারের গগন পাকড়াশি। ভাষাতত্ত্ববিদ হলে কি হবে মধ্যবিত্ততোষ ছবিতে নায়কের আয়ুধ সেই মাতলামি।

কিন্তু কোন চরিত্রে সব চাইতে বেশি বার দেখা গেছে উত্তমকুমারকে? শুনলে অবাক হবেন- ডাক্তার চরিত্রে। সংখ্যাটি নিদেনপক্ষে তের। ওরে যাত্রী (১৯৫১), কার পাপে (১৯৫২), মরণের পরে (১৯৫৪), সাগরিকা (১৯৫৬), পথে হল দেরী (১৯৫৭), জীবন তৃষ্ণা (১৯৫৭), ডাক্তার বাবু (১৯৫৮), সপ্তপদী (১৯৬১), সূর্যশিখা (১৯৬৩), অগ্নীশ্বর (১৯৭৫), আমি সে ও সখা (১৯৭৫), আনন্দ আশ্রম (১৯৭৭), সুনয়নী (১৯৭৯)। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবি আমরা দেখি নি। আবার কয়েকটি অসংখ্যবার দেখেছি। সাগরিকা, পথে হল দেরী, সপ্তপদী,অগ্নীশ্বর, আনন্দ আশ্রম - এই পাঁচটি ছবির যে কোনো চলচ্চিত্র উৎসবে যে কোনো দিন দেখানো যেতে পারে। এই শর্ট লিস্টের প্রথম দুটি ছবিকে রোমান্টিক কমেডি বলা যায়। শেষ দুটিকেও ইচ্ছাপূরণের ছবি বলা যায়। এ দুটিতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী ডাক্তরবাবুদের একটি প্রোটোটাইপ ধরা আছে। কিন্তু যে জন আছে মাঝখানে? সেটির জ্ঞাতগুষ্টি নির্ধারণ করতে গিয়ে কোনো সরলীকরণ বা তরলীকরণে যাওয়া বিপজ্জনক। কলকাতার মেডিকেল কলেজের চেনা মুখ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি আর সাঁওতাল পরগনার গ্রামের গ্রাম তস্য গ্রামে সেবাধর্মে নিয়োজিতপ্রাণ রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীর মধ্যে মিল নেই বললেই চলে। অথচ দুজন একই মানুষ। প্রেম, সমাজ আর ধর্ম— এই ত্রিশূলে বিদ্ধ একজন মানুষ। একজন ডাক্তারবাবু।

সপ্তপদী মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬১ সালে। রূপবাণী, অরুণা, ভারতীর চেইনে ১৯৬১ সালের ২০ অক্টোবর। অর্থাৎ পুজোর মরসুমে। অজয় কর পরিচালিত ও চিত্রায়িত এই ছবির প্রযোজক ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার। শিল্প নির্দেশক কার্তিক বসু। বাণিজ্যিক সাফল্য তো পেয়েইছিল, উপরি হিসাবে সে বছর প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল সপ্তপদী। পেয়েছিল রিজিওনাল সার্টিফিকেট অব মেরিট। এক নায়ক ছাড়া উত্তমকুমার অভিনীত কোনো ছবি লক্ষী ও সরস্বতীর যুগপৎ দাক্ষিণ্য লাভ করে নি। আমার এখনো মনে পড়ে, সিকি শতক আগে মিনার-বিজলী-ছবিঘর চেইনে নতুন করে মুক্তি পেয়েছিল সপ্তপদী। অন্তত এগারো হপ্তা চলেছিল। যারা ধর্মতলা-গড়িয়াহাটের ফুটপাথে জাল ডিভিডি-র খুচরো ব্যাপারী তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারবেন, হরেক এজ-গ্রুপের হরেক কিসিমের কাস্টমার তাদের কাছে উত্তমকুমারের কোন্ 'বই'-টির খোঁজ করেন বেশি। অবধারিত উত্তর পাবেন— সপ্তপদী। শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত আনতনেত্র উত্তমকুমারের বক্ষলগ্ন নিমীলিতনয়ন ও ঈষৎ বিস্রস্তবেশ সুচিত্রা সেনের ফটোগ্রাফটিকে প্রণয়গাথার পরাকাষ্ঠা বলে জেনেছে বাঙালি। সোনায় সোহাগা হয়েছে এ ছবির গান।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। হেমন্ত-সন্ধ্যা ও উত্তম-সুচিত্রা জুটির শঙ্খলাগা রসায়নের তুঙ্গ মুহূর্তটি এই ছবিতেই। 'এই পথ যদি না শেষ হয়/ তবে কেমন হত তুমি বল তো'— এই গানটি বাঙালি কতবার দেখেছে কতবার শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই। আঁকাবাকা ঐ অশেষ পথ ধরে নীল আকাশের ঐ দূর সীমা ছাড়িয়ে যাবে এই গান, এমন আভাস ছবিতেই ছিল। বাস্তবে তাই হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির স্মৃতিকাতরতার একটি অফুরন্ত রূপোলি ঝাঁপি হয়ে উঠেছে গানটি। কিন্তু গান নয়, এই আলোচনায় আমাদের চোখ থাকবে ডাক্তার-বাবুদের দিকে। পপুলার কালচারে চিকিৎসক সমাজের অবস্থানবিন্দু নির্ণয়ে সপ্তপদী-কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছি আমরা। বুঝে নিতে চাইছি কিভাবে চিকিৎসক ও চিকিৎসা পরিষেবার কোন্ ছবিকে তুলে ধরেছিল সপ্তপদী। আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে।

আমরা ধরেই নিচ্ছি সপ্তপদী আপনারা দেখেছেন। তাই গল্প বলে কাজ নেই। নেহাত সত্যের খাতিরে বলে রাখা ভালো যে সপ্তপদীর গল্পটি লিখেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯ সালে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়

বেরিয়েছিল উপন্যাসটি। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে বই হয়ে বেরিয়ে ছিল ১৯৫৪ সালে। কিন্তু বই বেরোনোর অনেক আগে থেকেই, মানে ১৯৪৯ সালে পূজোসংখ্যায় বেরোনোর ক বছর পরই সপ্তপদী-কে 'বই' করার কথা ভাবছিলেন উত্তমকুমার। আলোছায়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড গড়ে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় পা ফেলছিল তখন। আলোছায়ার প্রথম ছবি হারানো সুর (১৯৫৮)। হলিউডের র‍্যানডম হারভেস্ট ছবির বাংলা ভার্সান। চিত্রগ্রাহক তথা পরিচালক অজয় কর। হারানো সুর সাড়া জাগানো সাফল্য পায়। আর তখনই সপ্তপদীর ফিল্ম রাইট নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাইক পাড়ার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন উত্তমকুমার। সঙ্গী সেই অজয় কর। নানান স্মৃতিকথার পাতা উল্টালে জানা যায়, উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য— এই যাত্রাপথে বেশ কিছুটা একসঙ্গে হেঁটেছিলেন তারাশঙ্কর। তবে শেষ দৃশ্যটি তাঁর হজম হয়নি।

শেষ নয়, আমরা চোখ মেলবো সপ্তপদী-র শুরুতে। টাইটেল সিকোয়েন্স। ১৯৪৩ সালের অবিভক্ত বাংলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আকাশে বকের পাঁতি উড়ছে না, টহল দিচ্ছে বোমারু বিমান। ওরই মধ্যে লং শটে দেখতে পাচ্ছি একটি সাইকেল চলেছে গ্রাম বাংলার বুক দিয়ে। মহুয়া-সোনাঝুরির বনের ধার দিয়ে। সাইকেলের হ্যান্ডেলের সঙ্গে লাগানো একটি বেতের ঝুড়ি। ক্যারিয়ারের সঙ্গে একটি ডাক্তারি ব্যাগ। ধীরেসুস্থে চলে সাইকেল। তাতে আরোহী একজন ডাক্তারবাবু, অর্থাৎ উত্তমকুমার। পোশাক বলে দেয় তিনি একজন পাদরি, খ্রিস্টান মিশনারি। পোশাকি নাম রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামী। কেউ তাঁকে ফাদার সাহেব বলে, কেউ বাবাসাহেব। বাঁকুড়ার এই গ্রামটিতে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালান তিনি। তাঁকে সাহায্য করেন জোসেফ নামের আর এক মিশনারি। আর এক সবেধন নীলমণি দারোয়ান। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সাতসতেরো সামলানোর পাশাপাশি আশেপাশের এলাকার জনস্বাস্থ্যের অভিভাবকত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে 'গরিবের দেওতা' বলে মানে। কল পেলে নিমেষে রেল কোম্পানির লাইনম্যানের এক চিলতে কুঠুরিতে ঢুকে তার শিশুসন্তানটির দেখভাল করে যান তিনি। পারিশ্রমিক নেন না। গ্রামবাসীদের মুগ্ধতার উত্তরে বলেন, 'ভগবান বলতে তো তোমরা।' একটু বাদেই তাঁর শোবার ঘরের দেওয়ালে যিশুখ্রিষ্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর ছবির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও ছবি দেখি আমরা। শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শটিকে চিনতে পারি আমরা। গ্রামের একপাশ দিয়ে চলেছে একটি রেল লাইন। গ্রামের অন্য পাশ দিয়ে চলেছে একটি পাকা রাস্তা।

এই পাকা রাস্তার ধারে সেনাদের কুচকাওয়াজ চলে। মিলিটারি ট্রাক যায়। জিপে করে মার্কিন সেনার দল যায় গান গাইতে গাইতে। ডাক্তারবাবুকে দেখে 'গুডমর্নিং ডক' বলে যায়।

টাইটেল শেষ হবার আগেই একজন সর্বত্যাগী ডাক্তারবাবুর ছবি আমাদের স্বপ্নালু মনে আঁকা হয়ে যায়।

বিশ্বযুদ্ধের আঁচ পড়েছে বাঁকুড়ার গ্রামেও। একদিন রাতে একটি জিপ এসে দাঁড়ালো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উঠোনে। একটু বাদে জোসেফ এসে ঘুম ভাঙালেন বাবাসাহেবের। বললেন, একটি ওয়াকাই মেয়ে মদে চুর হয়ে এসেছে। এখনই আসতে হবে। আমাদের মনে থাকার কথা নয় ওয়াকাই মেয়ে কারা। 'ওয়াকাই' হল উইমেনস আর্মি কর্পস (ইন্ডিয়া)-র আদ্যক্ষরনিচয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্গতির দিনগুলিতে মার্কিন সেনাদের পাশাপাশি ত্রাণকার্যে হাত লাগাতে তাদের দরকার পড়েছিল। এই ওয়াকাই মেয়েটির হুঁশ ফেরাতে গিয়ে, মেয়েটির মুখচন্দ্রমায় চোখ পড়তেই নস্টালজিক হয়ে পড়লেন কৃষ্ণস্বামী। ফ্ল্যাশব্যাকে উঠে এলেন কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। ১৯৩০-এর দশকের কলকাতা মেডিকেল কলেজের একটি ঝকঝকে বাঙালি ছাত্র। আর রিনা ব্রাউন। সাহেব পাড়ায় ব্রাউন অ্যান্ড ব্রাউন অ্যান্ড কোং-এর কর্ণধারের আদুরে মেয়ে। কলেজ স্ট্রিটের বুকে একশো বছরের পুরোনো মেডিকেল কলেজে কৃষ্ণেন্দুর জুনিয়র তিনি।

এই ফ্ল্যাশব্যাকের খেই ধরে আমরা ঢুকে পড়ি স্বাধীনতার কয়েক দশক আগে মেডিকেল কলেজের অন্দরমহলে। এই অন্দরমহলে অসহযোগ আন্দোলনের জিগির নেই। সুভাষচন্দ্র বসু নেই। আছে ১৯১১ সালের আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের সঙ্গে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক ফুটবল যুদ্ধের মধুর অনুররণন। খালি পায়ে ফুটবল খেলে ইন্ডিয়ান মেডিকেল একাদশের বাঙালি ছাত্রের দল মিলিটারি মেডিকেল একাদশের গোরাদের জালে বল পাঠাচ্ছে, চোরাগোপ্তা কনুই মেরে গোরা স্ট্রাইকারকে ঘায়েল করছে- এসবের মধ্যে জাতীয়তাবাদ না থেকে পারে না। গোরাদের নাস্তানাবুদ করে কৃষ্ণেন্দু দাঁত বের করছেন, আর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে রিনা তাঁকে ব্রুট, ব্ল্যাকি হিদেন এইসব হাবিজাবি বলে গাল পাড়ছেন, গড-এর পানিশমেন্টের জুজু দেখাচ্ছেন আর নিষ্ফল আস্ফালনে কাদা মাটিতে হিল ঠুকছেন- আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অজয় করের এই দ্বৈতবাদী নির্মাণকে পড়তে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

ময়দানি মৌতাত কাটিয়ে মেডিকেল কলেজের মেইন বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ি আমরা। এখানে অনেক চরিত্র। বাঙালি-অবাঙালি। ভারতীয়-অভারতীয়। শাসক-শাসিত। এখানকার কলেজ রিইউনিয়নের ভ্যারাইটি প্রোগ্রামে কসমোপলিটন কলকাতার ঝাঁকিদর্শন হয়ে যায়। উত্তমকুমার ওরফে কৃষ্ণেন্দুর মুখ ফেরতা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই আশি বছর আগেকার মেডিকেল কলেজের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে— ওপেনিং সং বাই কমলা নন্দী। সঙ্গীত রাগমালা: নন্দিনী বালানি। ভারতনাট্যম: মীণাক্ষী লক্ষ্মণ। আধুনিক সঙ্গীত: রমা চৌধুরি। হাস্যকৌতুক: অমিতাভ রুদ্র। রবীন্দ্রসঙ্গীত: মনোতোষ মুখার্জি। মিক্সড ড্রামা: সিলেকটেড সিনস ফ্রম ওথেলো। ওথেলো: ডন

ক্লেটন, ডেসডিমোনা: রিনা ব্রাউন।

কৃষ্ণেন্দু মফস্বলের ছেলে। মাতৃউপাসক ব্রাহ্মণ বাবার একমাত্র সন্তান। কৃষ্ণেন্দুর মধ্যে অবশ্য বামনাইয়ের বংশ নেই। তিনি পাখির চোখ করেছেন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাকে। তাঁর মায়ের স্বপ্ন- 'খোকা তুই মস্ত বড় ডাক্তার হবি, বিলেত যাবি।' লেখাপড়া তো বটেই, খেলাধুলোতেও নাম করবে মায়ের বাছানি। স্বপ্নপূরণের প্রস্তুতিতে যাতে কোনো খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে মেডিকেল কলেজের হল্লামুখর হোস্টেল ছেড়েছেন কৃষ্ণেন্দু। ক জন বন্ধু নিয়ে উঠে গেছেন পার্ক স্ট্রিট-ক্যামাক স্ট্রিট মহল্লার নিরিবিলি এক ফ্ল্যাটে। তাঁর বাবার এতে অনুমোদন নেই। 'পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি। হুম, ফিরিঙ্গি পাড়ায় উঠে গেছে।' পদে পদে পা পিছলানোর হাতছানি কৃষ্ণেন্দুর অভিভাবকদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। কৃষ্ণেন্দু কিন্তু মনযোগ দিয়ে লেপটোস্পাইরা ইকটেরোহিমারোজিকা-র রহস্যভেদ করে চলেছেন। স্কাল স্টাডিতে মগ্ন হয়ে আছেন। কালাজ্বর না লিউকিমিয়া- এ নিয়ে কর্নেল প্রফেসরের সঙ্গে বিতর্কে জড়াচ্ছেন এবং জিতছেন।

তাঁর বাহন বাইক। পরনে সাদা ধুতির উপর ফুলস্লিভ শার্ট। ওয়ার্ডে থাকলে তার উপর সাদা অ্যাপ্রন। বাসায় চাদর। এমনিতে সাতে-পাঁচে নেই। তবে দরকার পড়লে পড়শি রিনা ব্রাউনদের বাড়িতে বার্থডে পার্টির হইহল্লাকে ছাপিয়ে কালীকীর্তন জুড়তে পারেন। যৌন ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ডন ক্লেটনের সঙ্গে রিনা ব্রাউনের সান্ধ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাটি করে দিতে পারেন। ওই রিইউনিয়নের দিন ডন ক্লেটনের লাস্ট মিনিট রিপ্লেসমেন্ট হয়ে ওথেলো সাজতেও দেখেছি তাঁকে। বঙ্গসন্তানের ইংরিজি অভিনয়ে মাত হয়ে রিনার মনে অনুরাগের ছোঁয়া লাগছে। 'অভিনয় করার সময় ও আমাকে টাচ করবে না' -এই বর্ণবৈষম্যবাদী ফরমানের উলটপুরাণ ঘটিয়ে স্পর্শসুখের মাধ্যমে রিনার যৌনজাগৃতি হচ্ছে গ্রিনরুমে আয়নার সামনে। সেদিন থেকে আজ অবধি মেডিকেল কলেজকে প্রেক্ষাপট করে অনেক ছবি বানানো হয়েছে। সপ্তপদী-র মতো এমন বহুমাত্রিক বিভায় আর কোথাও ধরা পড়ে নি এই শিক্ষাসত্রটি। ধন্য অজয় কর!

না, কৃষ্ণেন্দুকে মোটেই সুপারম্যান বানাননি তারাশঙ্কর বা অজয় কর। এমন চৌকস ছেলেপুলে সেকালের কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে দুর্লভ ছিল না। আমাদের চেনাশোনা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়-যতীন চক্রবর্তী ঐ আমলের ফসল। লেখাপড়া তো বটেই, ডিবেট থেকে শুরু করে বক্সিং রিং-সর্বত্র তাঁরা পারদর্শিতা দেখাতেন।

কাজেই মিস্টার ব্রাউন যে মেয়ে রিনার জন্য কৃষ্ণেন্দুকে লুফে নেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী! তাঁকে ধর্মান্তকরণে বাঁধার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। আমরা সপ্তপদীর-বহুলাংশ জুড়ে থাকা ধর্মীয় প্রসঙ্গে যাব না। জেনারেশন গ্যাপের ফাঁকফোঁকরে ঢুকব না। তারকালাঞ্ছিত প্রেমিকযুগলের জন্য চোখের জল ফেলব না। আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে ঢুকে পড়ব সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত কৃষ্ণেন্দুর চিকিৎসক সত্তা আর সেবক সত্তার সহাবস্থানের বৃত্তে।

কী করে মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডাক্তারদের গ্রাম-বাংলার ছোট-বড়-মাঝারি হাসপাতালগুলিতে পাঠানো যায়, এই প্রশ্নে মাথার চুল ছিঁড়ছেন শাসকশ্রেণী। এই তালিকায় নবতম সংযোজন বর্তমান সরকার। কিন্তু কি অনায়াসে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে নিম্নবিত্ত নিম্নবর্গীয়দের সেবায় নিজেকে সঁপে দিলেন কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি ওরফে রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামী। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এত বড় বিকেন্দ্রীকরণ? নাকি এর মূলে একটি ধর্মীয় অনুঘটকও ছিল। ফিরে পাওয়া রিনা ব্রাউনকে তিনি বলেছেন- 'ঈশ্বরের সাধনায় আমি শপথ নিয়ে এসেছি।' এই শপথ কি মেডিকেল কলেজের বিদায়কালীন শপথের চেয়েও বেশি অমোঘ? বলাই বাহুল্য হ্যাঁ। ইংরিজিতে একটি বাক্যাংশ আছে -মিশনারি জিল! মিশন না থাকলে মিশনারি হওয়া যায়? এই মিশন চিহ্নিত করে দেয় একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমত। মেডিকেল কলেজের শিক্ষাদীক্ষায় এই মিশনারি জিল নেই। ব্যতিক্রম আছে। আর ব্যতিক্রম তো বিধিকেই প্রতিষ্ঠা দেয়।

তাই তো কামার-কুমোর, জেলে-জোলা সবাই বাবাসাহেবের বশংবদ হয়ে থাকে। তাঁর মুখের কথায় তাঁর স্নেহের ছোঁয়ায় নতশির হয়। বলে, 'তোমার জয়জয়কার হোক বাবাসাহেব! তোমার জয়জয়কার হোক।' তাই আসামে যুদ্ধের প্রকোপ বাড়লে ফাদার লাফমো-র পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়েই উপদ্রুত এলাকায় রওনা হন বাবাসাহেব। ডেরা বাঁধেন রেডক্রশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এখানেই রিনা ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর মিলন সম্পূর্ণ হয়। জীবন সম্পর্কে বীতরাগ বিগতস্পৃহ রিনার মানসিক শুশ্রূষা চলে। রিনার কপাল থেকে চূর্ণ কুন্তলদাম সরাতে সরাতে যিনি বলেন,'তুমি কিছুই হারাওনি, তোমার সব আছে'; তিনি কি কৃষ্ণেন্দু না কৃষ্ণস্বামী? আমাদের গুলিয়ে যায়। জেগে থাকে রাত জেগে পীড়িতের সেবা করে চলা এক চিকিৎসকের মুখ। এই মুখের আদলে ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাক্তার বিনায়ক সেনদেরও পেয়ে যাই আমরা।

সব কিছুর উর্দ্ধে একজন আদর্শ চিকিৎসককে নায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দেয় সপ্তপদী। আর এই জন্যই এতদিন আগেকার একটি মেলোড্রামা আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক এবং আধুনিক হয়ে ওঠে।

এই আলোচনায় দাঁড়ি টানার আগে একটি মহাজনবাক্য স্মরণ করি।

বছর দশেক আগে গণশক্তি খবরের কাগজের জন্য 'রূপকথার উত্তমকুমার'-কে নিয়ে কলম ধরেছিলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। লিখেছিলেন— 'সামন্ততন্ত্রের সামাজিক স্তরে যে নিভৃত প্রণয় ও দাম্পত্য অসম্পূর্ণ থাকে তা উত্তম-সুচিত্রা মেলোড্রামাতে একটি অন্য অবকাশে সম্পন্ন হয়। উত্তমকুমারের অবস্থানে একটি বিনীত, সংরক্ত অথচ উদাসীন মুশকিল-আসান স্বস্তিবাচন আছে যা নক্ষত্রোচিত। হারানো সুর-এর শেষে তিনি যখন স্মৃতিভ্রষ্টতার অবসানে নায়িকাকে সম্বোধন করেন ডাক্তারবাবু বলে, নায়িকা তাঁর বক্ষলগ্না হওয়ার প্রাক মুহূর্তেই বুঝে যান বক্তা দুনিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, ঐ বক্ষপটে যাবতীয় দুর্যোগের অবসান।' ১৯৫৮ সালে হারানো সুর-এ ডাক্তারবাবুদের ওপরে প্রেমিকপ্রবরকে তুলে দিয়েছিলেন যে উত্তমকুমার, ১৯৬১ সালের সপ্তপদী-তে কি সেই ভুল সংশোধন করে নিয়েছিলেন তিনি? এভাবেই পোয়েটিক জাস্টিস হয়েছিল?

আমাদের তো তাই মনে হয়।

লেখক পরিচিতি: অংশুমান ভৌমিক শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প-সমালোচক।